একক ৮৬ ❐ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

৮৬.১ উদ্দেশ্য
৮৬.২ প্রস্তাবনা
৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা
৮৬.৪ মূলপাঠ ১ ·. (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?
(খ) গণনাট্য আন্দোলন এবং নবান্ন।
৮৬.৫ সারাংশ
৮৬.৬ অনুশীলনী ১
৮৬.৭ মূলপাঠ ২ : নবান্ন — প্রথম অঙ্ক
৮৬.৮ সারাংশ
৮৬.৯ মূলপাঠ ৩ ·. নবান্ন — দ্বিতীয় অঙ্ক
৮৬.১০ সারাংশ
৮৬.১১ মূলপাঠ ৪ ·. নবান্ন — তৃতীয় অঙ্ক
৮৬.১২ সারাংশ
৮৬.১৩ মূলপাঠ ৫ : নবান্ন — চতুর্থ অঙ্ক
৮৬.১৪ সারাংশ
৮৬.১৫ অনুশীলনী ২
৮৬.১৬ উত্তর-সংকেত
৮৬.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৮৬.১ উদ্দেশ্য

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন নাটকটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি নতুন ধারার সৃষ্টিকারী নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানবেন। এই এককটি পাঠ করলে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যুগান্তর সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- পরিশেষে জানবেন, 'নবান্ন নাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও অভিনয়ের উদ্যোগের উৎসটি।
- 'নবান্ন' নাটক ও তার উপস্থাপনা শুধুমাত্র নতুনতর আর্ট হিসেবেবেই প্রশংসনীয় ছিলনা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনা জাগাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- নবান্ন নাটকের মধ্য দিয়ে এটি উপলব্ধি করবেন, এটি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনবৃত্ত নয়, যুগ পরিবেশজাত জীবনের কথা।
- 'নবান্ন' ব্যক্তি জীবনবৃত্ত থেকে গোষ্ঠী জীবনকথা হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এ নাটক গণনাট্য।
- এ নাটক ভারত তথা বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত (১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৬ অক্টোবর সাইক্লোন ও বন্যা)।
- এ নাটকের পটভূমিতে আছে সন ১৩৫০-এর কুখ্যাত মন্বন্তর জনিত সঙ্কট (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা।
- নবান্ন এদিক থেকে হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক। নবান্ন গণনাট্যের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নাটক।

৮৬.২ প্রস্তাবনা

ইতোপূর্বে আপনি বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দুটি নাটক পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রাম ও তার দরিদ্র অসহায় কৃষক সমাজ—তাদের জীবনযাপনে সমস্যা সঙ্কট, ইংরেজ কুঠিয়ালদের শাসনপীড়ন, তাদের নায়েব-গোমস্তা পাইকদের অত্যাতারের পরিচয় পেয়েছেন। নাটকটি বসু পরিবারের পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কৃষকের সম্মিলিত শক্তি এখানে সংহত গণ আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অতিনাটকীয় উপাদানে নাটকের শেষ পরিণতি ঘটেছে।

'রথের রশি' (১৩৩৯) নাটকে আমরা প্রথম জনজাগরণের আভাস পেয়েছি। দেখেছি সভ্যতার রথ জনতার হাতের টানে উঁচুনিচু পথকে সমান করে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিক নাটকের এই প্রগতি ধারণা পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের বাস্তব ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হোল : 'People' বা 'গণ' অর্থে সমাজের বৃহত্তর অংশ—শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা শিল্প সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের নাটক গানে কবিতায় আলোচনা ও প্রচার করবার মঞ্চ হিসাবে গণনাট্য সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন। 'নবান্ন', ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তদানীন্তনকালে দেশের শোষিত কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় চতুর্দিকে সাড়া তুলেছিল।

আপনি এ হেন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গরূপ বর্তমান এককে পড়বেন। নাটকটি সমগ্রত পড়ার পর, আপনি নাটকটির বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, উপস্থাপনা নিজেই মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) খানখানপুর গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি এবং শেক্সপীয়র-চর্চায় অনুরাগ বিজন ভট্টাচার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যাত্রা, কথকতা ও মেলায় অংশগ্রহণ করায় বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশুতোষ কলেজে পরে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১-৩২-এ শরীর-চর্চা, জাতীয় আন্দোলন, পরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবসর সময়ে আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে লিখতেন। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত বই পড়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাপন ও অযত্নে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার এবং ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গ (IPTA) গঠন-এ তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। বিনয় ঘোষের 'ল্যবরেটরী'র তিনি নাট্যরূপ দেন। এগুলি অভিনীত হয়। এরপর তাঁর নাটক 'জবানবন্দী' অরণি'তে প্রকাশিত হয় আর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'নবান্ন'। এটি ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ আই. পি. টি. এ. কর্তৃক শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটিতে তিনি প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইত্যবসরে ১৯৪৩-এ তিনি খ্যাতনামাকবি ও গল্পলেখক মনীষ ঘটকের কন্যা, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে বিয়ে করেন, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য 'জীয়নবন্যা' লেখেন। 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ তিনি মতান্তরের কারণে গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বোম্বাই চলে যান জীবিকার অন্বেষণে। সেখানে তিনি কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। ১৯৫০-এ কোলকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ২০ বছর ধরে নাটক লিখে, অভিনয় করে, নাটক পরিচালনা করে জীবন ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার রূপকাশ্রয়ে জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনার জন্য 'দেবীগর্জন', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'কলঙ্ক', দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে—যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত পরিচালিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম', দিলীপ

রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী'-তে অভিনয় করা ছাড়াও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বস্তুত নাটক, গান, অভিনয় ছিল বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে ওতোপ্রোত। তথাপি, বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ও হতাশা, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফল সুন্দর জীবন উপকূলে পৌঁছে দিতে পারেনি।

৮৬.৪ মূলপাঠ—১ (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন? (খ) গণনাট্য আন্দোলন ও 'নবান্ন'।

(ক) ফরাসী চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রলাঁ তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত ভাবনা কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলো, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'দি পিপ্‌লস্ থিয়েটার', এ দেশে নাম দেওয়া হয়েছে 'গণনাট্য'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় য়ুরোপে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। চল্লিশের দশকে বৃটিশ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি প্রায় অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চল্লিশের এই গণনাট্য আন্দোলন বর্তমানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

রলাঁর মূল বক্তব্য হল প্রায়োগিক শিল্প বা পারফরমিং আর্টকে জনগণের কাছে যেতে হবে, তাঁদের জীবনকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ থিয়েটার হবে গনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার। তিনি এখানেই থামেননি। তিনি একে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আস্থা, তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার কেন্দ্র জনগণ। তিনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মত বুঝেছিলেন যে কোন সংকট উত্তীর্ণ হ'তে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ একক প্রচেষ্টায় নয়, ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই গণনাট্যের নাটক জীবনের জন্য, তার বিষয়বস্তু জনজীবন থেকে আহৃত। চরিত্র সমাবেশে থাকবে সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র নয়, সামগ্রিক অভিনয় দক্ষতার ওপর এই নাট্যাভিনয় নির্ভরশীল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে, তাঁদের নতুন জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফলত এ নাটক বস্তুত উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় আনন্দময় পরিবেশে, জীবন সম্পর্কে রাজনৈতিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা হবে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের জীবনানুগ-বাস্তব।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আন্দোলন শব্দটা সংযুক্তির তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার দরকার। আন্দোলনের দুটি পক্ষ—আন্দোলনকারী ও যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আর একটি প্রশ্ন, আন্দোলন কি জন্য? এবং কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা যা গরিষ্ঠ জনজীবনের পরিপন্থী, তাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়বার বা করবার জন্য আন্দোলন। কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বাইরে যে অগণিত জনগণ শহরে গ্রামে গঞ্জে ক্ষেতে খামারে কলে

কারখানায় নানান সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে, সেই সব মানুষের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য এই প্রয়াস। সেই দায়িত্ব অবিসংবাদিতভবে এসে পড়ল। তিরিশের দশকের মানুষের কাঁধে। মাঝখানের সময়টাতে দর্শকমণ্ডলী এমন কোন নাটক পায়নি যার মধ্যে নিজের মানসিকতার দুর্গতির সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারে—কোন চরিত্রের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সন্ধান পেতে পারে। বস্তুত নাটক জীবনের কাছে দায়বদ্ধ। তথাপি একথা বুঝবার বা বোজাবার চেষ্টা হয়নি সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে—নতুনত্ব পিয়াসী জনগণের কাছে যে নাটকের দায় ও দায়িত্ব কতখানি। অথচ নাটকের কারবার তো কেবল মাত্র মানুষকে নিয়ে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের জীবনের সম্পর্ক নাটকের বিষয়। নাটক মানুষের কথা বলে, জীবন যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রামের ভাষ্যকার সে তাই তার বক্তব্য বিষয় বস্তুত যা নিয়ে তা হ'ল জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, জীবিকার সঙ্গে বঞ্চনার, বঞ্চনার সঙ্গে প্রতিরোধের, প্রতিরোধের সঙ্গে সংগ্রামের বাস্তবসম্মত নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

বাংলা নাটকের পেশাদার মঞ্চ এই সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে পারেনি। ফলত জীবনবিমুখতা পলায়নবাদিতা, গতানুগতিকতা আর রোমান্টিসিজমের ধূম্রজালের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল সে। ইতিমধ্যে এসে গেল আর একটা মহাযুদ্ধ। শুরু হ'ল কালোবাজারী আর মুনাফাখোর মানুষের নৃত্য। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হতে লাগল। একদিকে স্বাধীনতা পাবার উদগ্র কামনা, অন্যদিকে শোষণ আর পেষণ থেকে মুক্তির আকুতি দিকে দিকে রণিত হতে লাগল। শুরু হ'ল জীবনের সপক্ষে—শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে, নাট্য আন্দোলন।

আন্দোলনের আরো সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, "আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য আন্দোলনের জন্য সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনে 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোনো বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' কথার অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ..... প্রাণবান নাটক মঞ্চজগৎ এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আন্দোলন কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল। ওই সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াচিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গামঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গামঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চপরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে জন্য নবাগত সিনেমা-নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গামঞ্চের অভিনয়ের প্রতি

এ সময় বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল, তাহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।"

সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মতবাদ এবং নতুন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী ভাবনা প্রথম দেখা গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘে। দীর্ঘদিন ধ'রে এই আন্দোলন চলে আসছে। পেশাদারী মঞ্চগুলিও পাশাপাশি পুরাতন ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে এবং দর্শক আকর্ষণের নানান কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের সুস্থ সংস্কৃতির ছিন্নপত্র সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলার যুবমানসের ওপর যে তীব্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে সেই সব নবলব্ধ চেতনা একে একে বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম, শোষক ও অত্যাচারী মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে বাংলা নাটক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল বাংলার মানুষের সঙ্গে। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলা নাটক বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ই প্রধান অংশ ছিল এই গণনাট্য সংঘের। এই সংঘের ভাবনা চিন্তা পেশাদার কোন মঞ্চের ভাবনা চিন্তার অনুসারী ছিল না, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

সংগঠিতভাবে 'গণনাট্য' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে গণনাট্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে। তা' না হলে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবেনা। 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' সংঘ একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্তরে মার্কসবাদী আদর্শ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের পরেই এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সংস্কৃতি আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োগ এদেশে শুরু হয়ে যায়। এরই ফলে ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মূল ঘোষণা ছিল 'ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা-দারিদ্র্য সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মীষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।'

এই ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে—'সাহিত্যেরবিষয় বস্তু কি হবে এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে

যে কেবলমাত্র রসের বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার হতে পারেনা। সেই শিল্পজাত রস আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে কিনা সেও একটা মানদণ্ড যা তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা বিচারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়নি।'

এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলার প্রায় অনেকগুলি জেলায় শাখা বিস্তার করে। নাটক সাহিত্যের এমন একটি অঙ্গ যা নতুন ভাবাদর্শ প্রচারে সক্রিয় এবং অগ্রগামী ভূমিকাপালন করে। আর যেহেতু, অভিনয় যোগ্যতা নাটকের মৌল শর্ত, সেই হেতু দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তা সহজেই ছাপ ফেলতে পারে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা 'নীলদর্পণ' আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেবে। ফলে দেশের লেখকদের সামনে একটা নতুন ঢেউ এলো। গল্প কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ছাত্র, যুবক, অফিসের কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা নাটক লেখা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকলেন।

(খ) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনে 'Peoples Theatre Stars the People'—এই বাণী শিরোভূষণ করে যাত্রা শুরু করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রাণবন্ত করে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। প্রভাবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছে। গণনাট্যের নাটক তাই সাধারণ নাট্যভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। জীবন্ত ও সচল জীবন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নাটককে বিচার করতে হবে সমসাময়িক দেশকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলি লেখা বলে, বিচারও করতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু নতুন, চিন্তাধারাও স্বতন্ত্র, প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রয়াস, সর্বোপরি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত, এর বিচার প্রচলিত মানদণ্ডে হতে পারেনা।

প্রথম পর্বে Youth Cultural Institution (Y.C.I.) (১৯৪০), পরে গণনাট্য সংঘ যে নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিল ; তা হল অঞ্জনগড় ও কেরাণী এবং ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী। এগুলিতে কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে অবহেলিত শেষিত সাধারণ মানুষ এবং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরে, তাদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। এমনি পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'নবান্নে'র জন্য।

নবান্নের পটভূমিতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিম্নবঙ্গে ফসল নষ্ট, সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা প্রতিকারহীন দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ক্ষুধা মেটাতে লঙ্গারখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে লোভী জোতদার মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক খাদ্য গুদামজাত করছে, এদিকে অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের নগ্নমূর্তির ছবি ও সেবাশ্রমের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে রমরমা।

এই ক্রান্তিকালে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশে তো বটেই ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলেছিলো। দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হ'তে থাকে। ইংল্যান্ডের

জনগণ বাংলার এই দুর্ভিক্ষের খবর জানতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ গণনাট্য সংঘকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যে উদ্যোগী হন।

People's Relief Committee (PRC)-র ব্যবস্থাপনায় গণনাট্য সংঘ মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা দান শুধু করেনি, আর্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশেরসামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

৮৬.৫ সারাংশ

বর্তমান এককের সূচনায় নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি একটি অভিনব নাটক যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা, দৃশ্যসমাবেশ আলো ও ধ্বনির সুষম বিন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তিজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের, দুর্গতির ও প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তুলে গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রস্তাবনায় জানানো হয়েছে 'নীলদর্পণ' ও 'রথের রশি'-র অবদানের পরিচয়। ইতিহাসের ধারায় নাটক ক্রমশ পুরাণ, ইতিহাসের সীমা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কালক্রমে এরই স্রোতোধারায় গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামীণ যাত্রা, কথকতা, মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রাম্য কথ্যভাষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এ সময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সর্বক্ষণের কর্মী হন। নানা কাজের মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধনীতি প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী থেকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ স্থাপন। এই গণনাট্য সংঘের জন্য তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক রচনা। শেষোক্ত নাটকটি তিনি শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। শেষ জীবনে, অভিনয়ই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র পাথেয় ছিল। হতাশা তাঁকে ঘিরে থাকায়, শেষদিকে তিনি ভগ্ন, রিক্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন।

পরিশেষে মূলপাঠ ১-এ গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। রম্যাঁ রল্যাঁর 'পিপল্‌স্ থিয়েটার'-এর ধারণা থেকে এ দেশে গণনাট্যের ধারণার সূচনা চল্লিশের দশকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনা জনজীবন থেকে আহৃত, উপস্থাপনা সহজ, সরল অনাড়ম্বর। তাই সাধারণ নাট্যতত্ত্ব দিয়ে একে বিচার করা ঠিক হবেনা। সমসাময়িক দেশকালের প্রেক্ষাপটে সচল জীবন্ত চরিত্রগুলিকে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

১৯৪০-এর দশকে রচিত গণনাট্যের নাটকগুলি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'নবান্ন' এই ক্রান্তিকালের সৃষ্টি।

৮৬.৬ অনুশীলনী ১

১। (ক) আপনার মতে 'নবান্ন' পাঠের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল—

(খ) বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক—

(গ) নবান্ন নাটকের রচনা কাল—

২। (ক) 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়—

(খ) 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটে আছে—

(গ) বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যে কোন দুটি অভিনীত চিত্রের নাম করুন—

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ——— তে' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর নাটক 'নবান্ন' —— ও ——— পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, অভিনীত হয় ——— মঞ্চে।

৪। (ক) গণনাট্য নামকরণের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) Y.C.I. এবং গণনাট্য সংঘ যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। প্রথম যুগের প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৬.৭ মূলপাঠ ২ নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিবাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটি মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল ; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে ঃ আর একজনের বয়স কম—

গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রধান। (হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এ সব কিছুর পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই ওই রকম। ওই রকম সোন্দর, ওই রকম নিদারুণ সোন্দর। (অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যভরে হেসে) তিন মরাই ধান। তিন মরাই ধান তুই আমারে কী বলিস্ কুঞ্জ! ..... জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। টুঁ শব্দ না। ঐ—

প্রধান। চল, চল্ কুঞ্জ আমরা এগিয়ে যাই।

কুঞ্জ। কী এগিয়ে যাই, পাগল না মাথাখারাপ!

প্রধান। মাথাখারাপ!

কুঞ্জ। মাথাখারাপ না তো কী বলব? (নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ) শুনছ ওদিকে, ঐ ঐ আবার—

প্রধান। আবার! আবার! ওরা ক'জনা?

কুঞ্জ। ক'জনা! কী করে বলব ক'জনা! চলো—

প্রধান। চল্ তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, তুমি—ঐ, ঐ আবার! চলো পালাই।

প্রধান। পালাব। পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান্ দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরেই পালাই।

প্রধান। (বিলাপের সুরে) আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। (প্রধানকে হাতে ধরে টেনে) তোমারে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা, বুঝলে, মহা জ্বালা।

[উভয়ে দ্রুত প্রস্থান]

[ত্রস্ত পায়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। (বিমূঢ়ভাবে) ওমা, এ কী বিপদ হলো, এখন যাই কোথায়।

[দ্রুত প্রস্থান]

[সন্ত্রস্তভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। (খালি গায়ে ছুটতে ছুটতে) তাই তো—সাংঘাতিক।

[দ্রুত প্রস্থান]

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না মেয়েমানষির, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না—

[দ্রুত প্রস্থান]

এলো চুলে উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে সোজা মঞ্চের ওপর দিয়ে রাধিকার দ্রুত প্রস্থান। সন্ধ্যার গোধুলি আলোর মতোই পটভূমির রক্তিম আভা বিষণ্ণ হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার মঞ্চের ওপর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনেকগুলো দ্রুত ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ঢুকে) থাক্ চলে গেছে। এসো, এসো তোমরা সব।

[প্রধানের প্রবেশ]

প্রধান। (কব্জির ওপরে ক্ষতস্থানে হাত চেপে) চলে গেছে? চলে গেছে, আবার আসতে কতক্ষণ?

কুঞ্জ। ও কী, রক্ত? কাটল কিসে? দেখি!

প্রধান। (তাচ্ছিল্যভরে ক্ষোভের সুরে) হে, এ রক্তের আবার দাম? এ রক্তের জন্যে আবার মায়া। জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গালে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ তুই আমারে ছেড়ে দে।—আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি—আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতির ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ। তা মিথ্যে হা-হুতাশ আর—

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, লজ্জাশরম খুইয়ে বনে-জঙ্গালে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর! কেন, বিত্তান্তটা কী! দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁরা কুঞ্জ?

কুঞ্জ। জেঠিমা তুমি!

পঞ্চাননী। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।

কুঞ্জ। বলো।

পঞ্চাননী। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথা! বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে, য়্যাঁ।

কুঞ্জ। কী বলব।

পঞ্চাননী। কী বলবি!

প্রধান। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে.....

পঞ্চননী। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটি নি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অঙ্গোর ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!! !! !!

কুঞ্জর দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পঞ্চাননীর দ্রুত প্রস্থান

কুঞ্জ। (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জৎ!! ইজ্জৎ দেখছে! জীবনটাই যেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়েমানুষের ইজ্জৎ! কিন্তু কিন্তু

[নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে কুঞ্জ]

প্রধান। ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু ; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি) —

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!!

[কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান]

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যা)!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে প্রধান

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (একটু লক্ষ্য করে) আপনি এলেন কবে!

যুধিষ্ঠির। এ অঞ্চলে দিনসাতেক হল এসেছি।

কুঞ্জ। জানতে পারিনি তো একেবারেই।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, তোমরা জানতে পারোনি ঠিকই, তবে আমি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে গিয়েছি। দিন তিনেক আগে, এই তোমার গত বুধবার হতে, একজন কাবুলিওয়ালা ঘুরে য়ায়নি তোমাদের এখান দিয়ে।

কুঞ্জ। (মাথা চুলকে) কাবুলিওয়ালা। সকাল বেলার দিকে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই বেলা আন্দাজ নটা নাগাদ? (একুট হেসে) আমিই সেই কাবুলিওয়ালা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আপনি সেই কাবুলিওয়ালা?

প্রধান। আপনি!

যুধিষ্ঠির। কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তুমি আমাকে খাচ্ছিলে না।

কুঞ্জ। ঠিক তো।

যুধিষ্ঠির। এই, আর একদিন রাত্তিরে। রতনগঞ্জ থেকে সেদিন আমি ঘোড়ায় ফিরছিলাম।

কুঞ্জ ও প্রধান বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠিরের দিকে

তা যাক-গে, সে সব কথা জানবার দরকার নেই তোমাদের। সময় খুব সংক্ষেপ, দু'চারটে জরুরি কথা বলেই চলে যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। কথাটা হচ্ছে যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দিক থেকে যে-কোনো ব্যবস্থা, তা সে যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্, বেড়ি দিয়ে ফেলি গে ওদের ; তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—আজ যদি আমার শ্রীপতি-ভূপতি।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান

কুঞ্জ। (যুধিষ্ঠিরকে একান্তে) শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটে ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির। না না পাগল নয় কুঞ্জ. প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক। প্রয়োজন আছে আজ এই উন্মত্ততার।

এ পাগলামি নয়।

প্রধান। না না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর প্রতি) তুমি বলছ পাগল, কিন্তু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্মত্ততা? ভুল—

ভুল কুঞ্জ, মহা ভুল প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ। পাগল নয়?

প্রধান। (অস্ফুটস্বরে) না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির। আমাদের অন্তরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অর্ন্তদাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

অভিভূত হয়ে গেছে কুঞ্জ। ভাববিহ্বল চিত্তে কী যেন ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর বুক চাপড়ে) আমার সময় হয়ে গেছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। (প্রধানের প্রতি) আবার আসব প্রধান।

[প্রথানুযায়ী যুধিষ্ঠির ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উর্ধ্ববাহু করে তুলে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কুঞ্জ ও প্রধান যুধিষ্ঠিরের অনুকরণ করে ..... যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।]

হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায় এবং ক্রমে সেই গণ্ডগোল বাড়তে থাকে। গভীর উত্তেজনায় কুঞ্জ চতুর্দিক লক্ষ্য করে। প্রধানও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ।

কুঞ্জ। জেঠা! জেঠা! ঐ! (হাত দিয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করে)

[কুঞ্জর দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) ঐ, ঐ আবার! ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ! কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেব!

[দ্রুত প্রস্থান]

নেপথ্যে গণ্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দেখা যায়,
বৃদ্ধা পঞ্চাননী একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢুকছে।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব! এগিয়ে যা।

জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা!

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা একটু ইতস্তত করে
এগিয়ে যা, এগিয়ে চল তোরা সব! এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা থমকে দাঁড়ায়

জনৈক ব্যক্তি। (ঘা খেয়ে) আরে ব্বাস রে, বাপ রে বাপ।

সকলে সমবেত কণ্ঠে এই -ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।.....

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা .....

মূহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু একজন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে

(ক্ষীণ কণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব .....

দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে। পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।

মঞ্চের উপর তিন-চারজন আহত লোক শুয়ে পড়ে ক্ষীণভাবে হাত-পা নাড়তে থাকে। পঞ্চাননীর কণ্ঠ নির্বাক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সুদূরের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে আসে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটা মশাল তখনও জ্বলছে।

(পটক্ষেপ)

প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, আর কুঞ্জর ছেলে—নাম মাখন! জল ভরতি একটা মেটে কলসি কাঁখে নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, ওরফে রাধি ঘরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়—রাধিকাকে—কাঁকালে পুরোনো একটা মেটে কলসি আর হাতে একখানা বস্তা। কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রাধিকা প্রথমে বস্তাটা উঠোনে বিছিয়ে দেয়, তারপর কলসির ধানগুলো চটের ওপর ঢেলে ফেলে পা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেড়ে দেয়।

প্রধান। (পা দিয়ে ধান নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ। কেন, মাচাং-এর ওপরে সেই সে কালো জালার ভিতরি যে পুরোনো আউস কতকগুলো ছিল?

রাধি। (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ, বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্যে সেই ধান। রোজ ক'সের করে চাল লাগে হিসেব করে দেখেছ কোনো দিন?

কুঞ্জ। (রাগত ভাবে) না, হিসেব করে দেখিনি, এমনিই চলছে।

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) নাও, ও অভাব-অভিযোগ তো লেগেই আছে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন সংসারে। তা বলে সকালবেলাই খামখা এট্রা অস্বরস কাণ্ড বাধিয়ে আর লাভ কী। চুপ করে যাও।

কুঞ্জ। না, তাই দ্যাখো একবার আচরণ। সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে। মোটে সহ্য করতে পারি নে। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, তার আবার—

রাধি। (রাগত ভাবে) হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে দ্যাখো না কেমন সোন্দর হাল হয়েছে শরীরের! (মুখ ভেংচে) আর বলো না, বুঝলে? পুরুষ মানুষের কিতিত্বের কথা আর বলো না। আমরা যে মেয়েমানুষ, আমাদের পর্যন্ত লজ্জা করে।

কুঞ্জ। ও—ো —োঃ, লজ্জাবতী লতা রে আমার!

[পিঁচ কাটে]

রাধি। (কটাক্ষ করে) দু'চক্ষে পেড়ে দেখতে পারি নে।

[রাধিকার প্রস্থান]

প্রধান। (আফশোসের সুরে) হায় রে ধান, হুঁঃ। এই দুটো ধানের জন্যে—

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) ন্যাও, থামো তুমি। তোমার আফশোস শুনতে আর ভালো লাগে না। পচে গেল কান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, সব খুইয়ে এখন ঐ আফশোসই সার হয়েছে। ভালো কাণ্ডকারখানা।

প্রধান। (আনমনে) সে কি দু'চারটে ধান! তিন তিন মরাই ধান।

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনের প্রতি) ন্যাও সামলাও এখন ঠেলা।

[প্রধান ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে]

নিরঞ্জন। (প্রধানের প্রতি) তা সে যা করেছে তা বুঝে শুনেই করেছে।

কুঞ্জ। বুঝে শুনে মানে, নিজে তো করেইছে, আর পাঁচ জনারে পর্যন্ত বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।

প্রধান। জোর করে প্রধান কাউকেই কিছু বলেনি।

কুঞ্জ। জোর করে মানে কি আর তুমি নিজে হাতে করে অপরের গোলার ধান নষ্ট করেছ আমি বলছি? অনুরোধ উপরোধ করে বাধ্য করেছ। উপরোধে মানুষ বলে ঢেঁকি পর্যন্ত গেলে, তার আবার—

প্রধান। উপরোধও করিনি।

নিরঞ্জন। বেশ তো তাই হল, উপরোধও করিনি। কিন্তু আচরণ করে শিক্ষে দিয়েছ।

প্রধান। হ্যাঁ তা দিইছি।

নিরঞ্জন। বিবেচনা করেই দিয়েছ?

প্রধান। (রাগতভাবে) হ্যাঁ দিইছি, বিবেচনা করেই দিইছি। যা করবার তোরা কর আমারে। য়্যাঁ, নৌকো ছিল আমি আটকে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্তরি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর।

[অস্থির হয়ে ওঠে প্রধান]

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) তোমাকে আবার কে কী করতে চাচ্ছে মাঝে মাঝে আপনা থেকে আফশোস কর বলেই তো এই সব কথা ওঠে। যা গিয়েছে—গিয়েছে, য়্যা। এই তো, ক'মাস পরেই আবার আমন ধান পাওয়া যাবে। তেমন একটা অঘটন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় না ঘটে তো ভাতের আবার ভাবনা! (স্ত্রী রাধিকার উদ্দেশ্যে) কই, গেলে কোথায়? (মাখনের প্রতি) ডাক দিকিন মাখ তোর মা-রে।

মাখন। মা এসে আবার কী করবে?

কুঞ্জ। (ধমকের সুরে) কী করবে তা বুঝবখন আমি। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা, ডাক শিগ্‌গির।

মাখন। যাচ্ছি।

[মাখনের প্রস্থান]

কুঞ্জ। মুখ থেকে দুধের গন্ধ গেল না, এর মধ্যেই তক্ক করতে শিখেছে মুখে মুখে। মা-টি আবার কেমন দেখতে হবে তো।

[রাধিকার প্রবেশ]

কী, খুব তো মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলে তখন। বলি রাগ করে বসে থাকলে কি পেট ভরবেখন সকলের?

রাধি। ওমা, রাগ আবার করলাম কখন!

কুঞ্জ। না, পা থাবড়ে যে বড়ো ঘরে গিয়ে উঠলে, সেই কথা বলছি।

রাধি। তা উঠলামই বা। কারো তো কিছু এসে যাচ্ছে না তাতে!

কুঞ্জ। তা এসে যাচ্ছে বই-কি। শুধু শুধু আর কি হাত গুটিয়ে বসে আছি? নাও, দাও দিকিন এইবার তোমার সেই—

রাধি। (আঁচ করে একটু রেগে) কী দেবে?

কুঞ্জ। (চোখ বুঁজে) আরে কী যে বলে ওর নামটা—

রাধি। আ হা হা হা, মশকরা দেখলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে যায়।

কুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, তোমার সেই—

রাধি। —মলজোড়া, এই তো?

কুঞ্জ। হ্যাঁ।

রাধি। তা সে কি আর আমি বুঝিনি! মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে একটু ভনিতে করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সে মলজোড়ার ওপর টনক নড়ছে। হায় অদেষ্ট!

কুঞ্জ। না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্‌নি, হ্যাঁ। কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।

রাধি। বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক্ ; সে আমার সৌভাগ্যি।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, তাই তাই। নয়তো তুই যে ভাবছিস আমি মরে গিয়ে তোর উদোমে খাবার ব্যবস্থা করে দেব, সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে গুড়ে বালি।

[হঠাৎ ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে বাসন পত্তর সব টেনে বের করে আনে]

বাপের বাড়িওয়ালারা যে মস্ত বড়লোক, ঠ্যারেঠোরে ও শুধু আমারে সেই কথাই শোনায়। তোর দেমাক আর ঠেকারের নিকুচি করেছে!

[ঝনাৎ কর বাসনের পাঁজা নামায়। ত্বরিতপদে রাধিকার প্রস্থান]

নিরঞ্জন। তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে?

কুঞ্জ। দোকানে, আবার কোথায়? পেট তো ভরাতে হবে গুষ্টির!

[কাশতে কাশতে আর বক্ বক্ করতে করতে ঘরে প্রস্থান]

প্রধান। ও মাখন, মাখন।

নিরঞ্জন। দুত্তুর কলা নিকুচি করেছে তোর সংসারের। শালা আজই আমি চলে যাব।

[কলসি কাঁখে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। কোথায় যাবে?

নিরঞ্জন। এই এলেন আবার আর এক সঙ্। যত সব হয়েছে।

বিনোদিনী। ওমা, আমি আবার কী করলাম?

নিরঞ্জন। কিচ্ছু করনি বাপু, কিচ্ছু করনি। যাও, এখান থেকে যাও। আর ভালো লাগে না। আমি আজই শালা চলে যাব।

বিনোদিনী। কোথায়?

নিরঞ্জন। কোথায় কি আর আমি ঠিক করে রেখেছি? যাব এমনিই, যেদিকে দু চোখ যায়।

বিনোদিনী। ওমা, সে কী কথা?

নিরঞ্জন। না দিনরাত তোমাদের এই সংসারের ভেতরে পড়ে ঝালা-পালা হই আর কী। আমি আজই চলে যাব।

বিনোদিনী। তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) সঙ্গে নিয়ে চলো! তুমি যাবে কোথায়?—তুমি যাবে কোথায়? নিজেরই বলে দাঁড়াবার জায়গা নেই, তার আবার,—আগে রও, আমি তো যাই!—তারপর দেখি যদি একটা কাজটাজ জোটাতে পারি তো সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার কী?

বিনোদিনী। একা যাবে তুমি?

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) তো দোকা পাব কোথায়?

বিনোদিনী। কেন, নাও না আমায় তোমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন। পাগল্ না মাথা খারাপ! আমিই বলে তাই এখন কোথায় যাই কী করি তার ঠিক নেই, ঘাঁটিয়ো না মিছে হ্যাঁ, ভালো লাগে না।

বিনোদিনী। আজই তো তাই বলে চলে যাচ্ছ না?

নিরঞ্জন। কেন, যদি বলি আজই, তো বাধা কিসের?—বাধাটা কিসের?

বিনোদিনী। বাধা মনে করলেই আছে, না করলেই নেই। আমি থাকব এখানে একলা পড়ে—

নিরঞ্জন। আহা বলি একলাটা কিসের হল? যত সব প্যান্-প্যানানি এই মেয়েমানুষের।

বিনোদিনী। তা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—

নিরঞ্জন। জন্মেছ তো বেশ করেছ। ও কোনো কথা আমি তোমার শুনতে চাইনে। আর পাঁচজনও থাকবে, তোমাকেও থাকতে হবে তাদের সঙ্গে। গোঁয়াতে পার ভালো, না পার—আমি তার কী করব? আমারে চলে যেতেই হবে,—আজ না হয় কাল।

[বিনোদিনী চোখ মোছে]

একেবারে তো অজলে অস্থলে ফেলে যাচ্ছি নে। দাদা থাকল, বৌদি থাকল, জেঠা থাকল, মাখন থাকল, আবার ভয়টা কিসের? পরলোক তো এরা কেউই নয়! দেখছ এই অবস্থা, নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে, এখন বুঝে শুনেও যদি তোমাদের আগলে বসে থাকি তো শেষকালে?—ভেবে দেখেছ কখনও পরিণামটা ? হুঁঃ, শুধু কাঁদলে হয় না। অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হয়। (ধরা গলায়) কাঁদছে, কাঁদতে অমন আমিও পারি। কিন্তু কী দাম আছে সেই চোখের জলের? কিছু না।

[পরিশ্রান্ত কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিরঞ্জনের প্রতি) ফের মেরেছিস বুঝি? (নিরঞ্জন নিরুত্তর) বলি ফের্ আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?

[সাশ্রুনয়নে বিনোদিনীর প্রস্থান]

(চেঁচিয়ে) বেরো, বেরো তুই এখনই আমার বাড়ি থেকে, বেরো। ছোটলোক, চামার! অভাবে পড়ে এর মধ্যেই স্বভাব নষ্ট করে বসেছিস—বেরো, বেরো তুই এখুনি। পশু কোথাকার!!

উন্মত্ত অবস্থায় সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করে বসে।

মেয়েমানুষের গায়ে হাত ..... বেরো, বেরো তুই, বেরো !!

[আঘাতে নিরঞ্জনের মাথাটা ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত। নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

কুঞ্জ। (বিমূঢ়ভাবে) য়্যাঁ, রক্ত! রক্ত! খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনকে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!

(পটক্ষেপ)

দাওয়ার ওপর বসে প্রধান আনমনে তামাক টেনে চলেছে, আর কুঞ্জ উঠোনে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। দেখলেই মনে হয় আগে থেকেই যেন কী একটা আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

প্রধান। (হুঁকোয় বিলম্বিত একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে) তা হল থাকবে? কী, কথা বলিস না যে?

কুঞ্জ। কী বলব? জমি তোমার, দ্যাখো তুমি বিবেচনা করে।

প্রধান। হ্যাঁ তা সে তুই কী বলিস?

কুঞ্জ। আমি তো বলেছি আমার কথা।

প্রধান। কী?

কুঞ্জ। কাজ নেই কবালা করে।— মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?— তো কী হবে খামখা জলের দামে জমি বিক্রি করে? ও সে যা করেছ তা করেছ। আর বেচে কাজ নেই। য়্যাঁ-া-াঃ, আছেই আর ভারি বিঘে তিনেক!

প্রধান। তা হলে যা হয় এট্টা ঠিক করে বল খামখা—

কুঞ্জ। আবার ঠিক করে কী! বলছি তো থাক। বিশেষ ফসল যখন একবার হয়ে গেছে। রোওয়া। আর অভাব? সে তো আছেই । ও জমি বেচলেও থাকবে, না বেচলেও থাকবে। দ্যাখা যাক। দিন কি আর এমনিই যাবে!

[প্রতিবেশী দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। (গলা খাঁকারি দিয়ে প্রধানকে লক্ষ্য করে)। এই যে প্রধান।—বাড়িতেই আছো তা হলে দেখছি!

প্রধান। (চারিদিকে চেয়ে) হ্যাঁ, সকালবেলার থেকেই কেমন কেমন যেন একটু ঘোর ঘোর ভাব—

দয়াল। বিষ্টিই বোধ করি আসে।

প্রধান। তা বস। উঠে বস। তামাক খাও।

দয়াল। (বসতে বসতে) তামাক বা খাব কী?

প্রধান। কেন, যাচ্ছিলে নাকি কোথাও?

দয়াল। না এই।

প্রধান। (দয়ালকে হুঁকো এগিয়ে দিয়ে) ধরো।

কুঞ্জ। (উঠোনের এক কোণে বসে) দয়ালদা কী বল এ কথার?

দয়াল। কী বিষয়!

প্রধান। আর কি বিষয়!

দয়াল। তবু শুনি।

কুঞ্জ। বিষয়টা হচ্ছে যে জমি জায়গা বিক্রি করা নিয়ে।

দয়াল। বেশ।

কুঞ্জ। বিলের ধারে ঐ যে বিঘে তিনেক খামার জমি আছে না জেঠার? তাই বলছিল বিক্রি করে ফেলি।

দয়াল। তারপর?

কুঞ্জ। তা আমি বলি কী যে ও দুঃখ-কষ্ট যা কপালে আছে সে তো আছেই, মাঝখানে থেকে জমিটুকু খুইয়ে আর কী এমন সৌভাগ্য বাড়বে!

দয়াল। সে তো ঠিক কথাই। রুজি রোজগার না থাকলে জমি বেচে আর ক'দিন চলে।—আমি নাকি যে ভুল করেছি!

কুঞ্জ। বেচে ফেলেছ নাকি জমি তুমিও?

দয়াল। হ্যাঁ তা সে কিছু তো বেচে ফেলেইছি। কিন্তু সেই বেচেই বা হল কী? বীজ ধানগুলো পর্যন্ত রাখতে পারলাম না উঃ।

কুঞ্জ। তোমার তা হলে তো দেখি আরও সরেস অবস্থা! সব খুইয়ে বসে আছ?

দয়াল। সব, সব। কুঞ্জ, সব। একমুঠো চালের জন্যে তোর দয়ালদা তা না হলে কি আর আজ দোরে দোরে ঘুড়ে বেড়ায়! উঃ!

প্রধান। ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল। কিন্তু বড়ো ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত। এইটাই বুঝলাম।

কুঞ্জ। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) হ্যাঁ বুঝলে বটে, (দয়ালের প্রতি) তবে কি না বড্ড দেরি করে বুঝলে।

দয়াল। (করুণ হেসে সঙ্গে সঙ্গে) এমন সময় বুঝলে যে শুধরে যে নেবে তার পর্যন্ত সময় থাকল না।

প্রধান। (দয়ালের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে) তা হলে থাক জমিটুকু।

দয়াল। থাক্ থাক্, সম্বল থাক্, জমিজায়গা এমনিই বিক্রি করতে নেই, তার ওপর—

প্রধান। থাকতে তো বলছ, কিন্তু এদিকে দিনপাত চলে কী করে বলো তো? বাঁচতে তো হবে?

দয়াল। তা তোমাদেরও কি এইরকম অবস্থা নাকি?

প্রধান। তো তুমি কী ভাবছ?

দয়াল। কেন ধান তো তোমার ছিল প্রধান।

প্রধান। হ্যাঁ সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন কী আছে তাই বলো।

দয়াল। এই রকম অবস্থা নাকি! আমি ভাবলাম যাই, প্রধানের ওখানে একবার যাই। যদি কিছু—

প্রধান। হুঁ, সে কথার আর কী বলব বলো। এই তো দ্যাখো না, সকাল বেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চেঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের-দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?

দয়াল। তা তো ঠিকই! কিন্তু আমার যে এদিকে সমস্যাই হল। ঘরে একদানা চাল নেই, প্রধান, আজ দু'দিন। রাঙার মা বলতে গেলে সে একরকম ধুঁকছে কাল বিকেল বেলা থেকে। কী করি বলো তো?

কুঞ্জ। আর কী হয়েছেই এই!

দয়াল। কুঞ্জ!

কুঞ্জ! কী বলব বল এ কথার! রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকালবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (ঘর থেকে চাল নিয়ে আসে কোঁচড়ে) ন্যাও ধরো, মুঠোখানেকের বেশি কিন্তু দিতে পারব না দয়ালদা। এই আমাদের শেষ সম্বল।

দয়াল। (কোঁচড় পেতে) ঐ মুঠোখানেক হলেই চলবে বাপ আমার। জানটা তো আগে রক্ষে পাক।

কুঞ্জ। কিন্তু এই রকম করে আর কদ্দিন?

দয়াল। যদ্দিন যায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এ তো থাকবেই।

প্রধান। তা শুধু আশ দিয়ে তো আর পেট ভরবে না দয়াল, ব্যবস্থা এর এট্টা করতে হয়।

দয়াল। বলো কী ব্যবস্থা করবে। আমি তাতেই আছি।

প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কেন শহরে? অন্নকূট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

কুঞ্জ। থাক তোমার বাবুদের কথা আর শুনতে চাই নে।

দয়াল। হ্যাঁঃ, ও বাবুদের কথা আর বলো না।

কুঞ্জ। যার জন্যে করি চুরি শেষকালে সে-ই বলে কি না চোর!

প্রধান। ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।

কুঞ্জ। তা সে ভদ্দরনোকও আছে, ভদ্দরনোকও নেই। তা বলে ফর্সা জামা-কাপড় পরে ভালো বাংলায় হ্যানা করো ত্যানা করো বললেই ভদ্দরনোক বলে তার কথা মেনে নিতে হবে? থে-ে-ে-ঃ!

প্রধান। না, তা কেন হবে?

কুঞ্জ। তো তবে?

দয়াল। যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন বর্তমানের কর্তব্য কী তাই—

প্রধান। তা সেই কথাই তো বলছি। বলি—

কুঞ্জ। বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তার নেমে দাঁড়াতে হবে।

প্রধান। তা হলে যে আশংকা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল।

দয়াল। আর হওয়া-হউইর তো কিছুই নেই। ঐ এক রাস্তাই খোলা আছে, ঐ এক পথেই যেতে হবে সকলকে।

প্রধান। তাই তো বলছি। বলি শহরে—

কুঞ্জ। তা সে তুমি শহরেই বলো আর নরকেই বলো, পথ ঐ এক। সরা হাতে করে গুষ্টিশুদ্ধু, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।

প্রধান। পথে নেমে দাঁড়াতে হবে? প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে দয়াল!

দয়াল। তাই তো বলছি—বলি শেষ পর্যন্ত এ-ও চোখ চেয়ে দেখতে হবে। অদেষ্ট, সব অদেষ্ট।

প্রধান। এই, তা যদি না হবে তো দ্যাখো জমিজমাই বা খোয়াতে যাব কেন আমি, আর আজ পথে নেমেই বা দাঁড়াতে হবে কেন আমায়? অদেষ্ট ছাড়া আর কী?

কুঞ্জ। নাও মিথ্যেমিথ্যি আর অদেষ্টর দোহাই পেড়ো না, হ্যাঁঃ। নিজে ইচ্ছে করে আগুনে হাত

দেবে, আর পুড়ে গেলে বলবে যে অদেষ্টর জন্যে এই দুর্ভোগ হল। ..... তোমাদের এই ধরনের কথাবার্তার, সত্যি বলছি দয়ালদা, আমি কোনো মানে বুঝতে পারিনে, কোনো মানে বুঝতে পারিনে। তোমরা সব—

[ঝড়ের বেগে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। তোমরা সব চালার ওপর ওঠো, চালার ওপর ওঠো! সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে, ভীষণ বান, হই—ই—ই—ঃ।

নেপথ্যে বানের ডাক—সোঁ সোঁ

কুঞ্জ। তাই তো! [মাখনের ঘরে প্রস্থান]

দয়াল। আমি চলি প্রধান তা হলে। সকালবেলার থেকেই আজ কেমন যেন ঘোর ঘোর ভাব, গরম গরম হাওয়া দিচ্ছিল কাল রাত থেকে। কী ব্যাপার!

বাতাসের দমকা ঝাপটা

আরে ব্বাসরে! [দয়ালের প্রস্থান]

কুঞ্জ। আরে বসে যাও দয়ালদা, এর ভেতর বেরিয়ো না।

[বাতাসের ঝাপটা]

এ যেন একেবারে ফেলে দিতে চায়!

নেপথ্যে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, মড় মড় মড়াৎ। প্রধান দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চোখের ওপরে হাত দিয়ে দুরে বান লক্ষ্য করতে থাকে । চুলগুলো তার সব যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে মাথায়। কাঁচা পাতা, পল্লব, ডাল, সব ছিঁড়ে এসে পড়ে উঠোনে। দোচালাখানা নড়তে থাকে ঘন ঘন—যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আর কী। বান আর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে অব্যাহত—সাই-শোঁ-সন্। আলোটা অস্পষ্ট। একটু পরেই ওঠে হাহাকার আর আর্তকণ্ঠের উপায়বিহীন আক্ষেপ। কেউ হয় তো চাপা পড়েছে, কেউ হয়তো চাপা পড়ে বেরোতে পারছে না। সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকেও যেন সেই আক্ষেপ ঝড়ের গলা ধরে এসে প্রধানের দোচালার ওপর আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে দোচালাখানা ভেঙে পড়ে প্রধানের।

প্রধান। (ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মাঝখানে উন্মত্ততায়) কুঞ্জ, মাখন, (চোখ-মুখের ওপর থেকে বৃষ্টির ছাঁট মুছে) এই যে এদিকে, মাখন! কুঞ্জ! মাখন!

[হন্তদন্ত হয়ে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। এই যে দাদু। আমি, আমি এখানে।—বাবা কোথায়, বাবা? বাবা!

[রাধিকার প্রবেশ]

রাধিকা। (ছুটে এসে) মাখন! মাখন! মাখন কই! মাখন!

মাখন। এই যে আমি এই যে এখানে।

রাধিকা। কই, কোথায়! (মাখনকে জড়িয়ে ধরে) বাপ আমার!

প্রধান। কুঞ্জ কোথায়! কুঞ্জ!

কুঞ্জ। (চাপা গলায়) এই যে! এখানে। মাখন!

প্রধান। কোথায়! কুঞ্জ! মাখন! কোথায় তোর বাপ!

মাখন। এই যে দাদু! দাদু! উঁচু করে ধরো চালাটা, দাদু বেরোতে পাচ্ছে না ; ধরো তুলে ধরো!
(প্রধান ছুটে গিয়ে চালাটা উঁচু করে ধরে। রাধিকা কুঞ্জকে বেরিয়ে আসতে সাহায্যে করে।)

রাধিকা। লাগেনি তো কোথাও?

কুঞ্জ। না। মাখন কই! এই যে!

প্রধান। ঠিক আছে তো আর সবাই।

রাধিকা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) বিনো কোথায়?

কুঞ্জ। সে কী, দ্যাখো, দ্যাখো শীগ্‌গির। ওর নিচে চাপা পড়েনি তো? কী—ি—ি—ি।

মাখন। এই যে এখানে। বাবা।

(সকলে বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে যায়। বিনোদিনী অচৈতন্য।
রাধিকা বিনোদিনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।)

রাধিকা। ও মা, তোমার সব দ্যাখো গো ও বিনো, বিনো—
(কুঞ্জ, রাধিকা ও মাখন বিনোদিনীকে ধরাধরি করে সামনের ফাঁকা জায়গায় এনে শুইয়ে দেয়।)

কুঞ্জ। (বিনোদিনীর চোখ টেনে) চোখে লেগেছে বোধ হয় খুব জোর।

রাধিকা। বি নো। অ বি নো—

[বিনোদিনী ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে।]

প্রধান। বেঁচে আছে তো রে কুঞ্জ।

কুঞ্জ। আ—া হা—াঃ, থামো তো তুমি।

রাধিকা। (বিনোদিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) যত সব অলক্ষুণে কথাবার্তা। ও বিনো, বিনো। এখন এট্টু! — কী! — কোথায় লেগেছে?

কুঞ্জ। থাক্, উদ্ব্যস্ত করো না। থাক ঐ রকম।

[নেপথ্যে আর্তের হাহাকার।]

প্রধান। থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে,—প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ..... কুঞ্জ! .... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!!

দয়াল! (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.... সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

(ঝড়ের শব্দ—সাঁই-সং)

(পটক্ষেপ)

জীর্ণ-গৃহ পরিবেশ। খসে খসে পড়েছে চালা। কোনো কোনো জায়গায় খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকাল দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। উঠোনে বিনোদিনী উনুনের ধারে বসে কী যেন একটা সেদ্ধ করছে হাঁড়িতে আর জ্বাল ঠেলছে। দাওয়ার ওপর বসে আছে রুগ্ণ মাখন।

বিনোদিনী। (উনুনের মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে গিয়ে চোখে মুখে ধোঁয়া খেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুরে বসে) বাব্বা, এ কাঁচা পাতা কি ছাই জ্বলে? ধোঁয়া খেতে খেতে প্রাণ গেল। নাঃ, বসা যায় না!

মাখন। তা সে ওখানে বসে ধোঁয়া খেয়ে মরছ ক্যানো? মোটা একটা ডাল লাগিয়ে দিয়ে দাওয়ার ওপরে এসে বসো দিকিন্! সেদ্ধ হচ্ছে তো ভারি জগডুমুর—গরুতেও খায় না! সরে এসো একখানা ডাল লাগিয়ে দিয়ে! যে না আমার রান্না!

বিনো। নে, বসে বসে তুই আর সব সময় ফোঁপরদালালি করিস নে তো মাখন। চুপ করে থাক। এই রান্নারই বলে দাম দেয় কে, তার আবার—

মাখন। নিত্যি, ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল ও আজ আমি কিছুতেই খাব না।—

বিনো। ওঃ, না খাস তো আমার ভারি বয়েই গেল। আনলেই পারিস ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে।

(জীর্ণ বসনে এক-পা কাদা নিয়ে প্রধানের প্রবেশ কোঁচড়ে একগাদা খুদে কাঁকড়া)

প্রধান। (হেসে) ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে আনা কি সহজ কথা? (কোঁচড়ের কাঁকড়া নেড়ে) এই কটা তাই কত করে, —দেখি এট্টা পাত্তর টাওর—না, তাই বা আবার পাবো কোথায়।—এই কোনো এট্টা কিছু, ঢেলে দেব।

[বিনোদিনী প্রস্থানোদ্যত]

—যা হয় এট্টা নিয়ে এসো খপ্ করে।—ওঃ, গা-হাত-পা একেবারে চুলকে মলাম। পচা কাদা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান]

মাখন। ধরলে কোত্থেকে, অনেকগুলো তো! সে দিনকারগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট। আজকেরগুলো বেশ ডাগর ডাগর।

প্রধান। (হেসে) বড় হয়ে উঠেছে সব। জলেও টান ধরেছে, আর সব এখন খাল খন্দর ভেতরে গিয়ে সিঁদুচ্ছে। ধরা কি সহজ কথা?.....

[ভাঙা একটা চুবড়ি নিয়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

এনেছ, রাখো। (হাসতে হাসতে) নুন লঙ্কা দিয়ে খুব খটমটে করে ভেজে নিয়ে....মাখনরে দিয়ো যেন বৌমা দুটো খানি।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। মাখনরে আবার কী দেবে?..... কিচ্ছু দিয়ো না ওরে খেতে টেতে। জিতেনবাবু বারণ করে গেছেন পই পই করে।

মাখন। খাব তো না, এমনি এট্টুখানি চেখে দেখব।

কুঞ্জ। ওঃ, সুখ খায় গুড় দিয়ে মুড়ি। আর চোখে দ্যাখে না। চোখে দেখব! জিনিসটা কী শুনি?

মাখন। ক্যাঁকড়া।

কুঞ্জ। য়্যাঁ, ক্যাঁকড়া! ক্যাঁকড়া খাবি তুই?..... খবরদার ও যেন ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া না খায়। হ্যাঁ, এই বলে দিলাম সবাইকে।

প্রধান। তো শাসাচ্ছিস কারে তুই তাই বলে, য়্যাঁ! আ গেল যা। তিরিক্ষে হয়েই আছে মেজাজ দেখি সব সময়।

[এক বোঝা শাক পাতা নিয়ে রাধিকার প্রবেশ]

কুঞ্জ। (ক্ষোভে ও দুঃখে) ও, মেজাজ দেখলে! এর ভেতরও মেজাজ দেখলে? আমি বলে সারাটা দুপুর এই রোদ্দুরের ভেতরে পাতি পাতি করে সন্ধান করে জোগাড় করে নিয়ে এলাম

কাওনের চাল কটা, ডাক্তার বলে গেছে, আর এসে শুনি যে ছেলে আমার ক্যাঁকড়া খাবার জন্যে ব্যাগ ধরেছেন। তোর অপত্য স্নেহের নিকুচি করেছে.....(গামছা থেকে কাওনের চালগুলো ছড়িয়ে দেয়) যাগ্‌গে, দরকার নেই কাওনের চালের, যাগ্‌গে।

রাধি। তা এত কষ্ট করে না আনলেই পারতে। এনে আবার ছড়িয়ে নষ্ট করার দরকার ছিল কী?

কুঞ্জ। (দুঃখে) আমার সব কষ্টের মূল্য তো চিরকালই এই রকম। এর বেশি আর কবে কোন দিন পেয়েছি?

[রাধি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে]

প্রধান। (উঠে গিয়ে) দে, দেখেছ কাণ্ডবাণ্ড, দেখেছ? (হাত দিয়ে চালগুলো সাপটে) সারাটি দিন এই কষ্টের কষ্ট করে কাওনের চাল কটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এল, কী না কী বলেছি— অমনি দিলে তারে ছড়িয়ে মাড়িয়ে—

কুঞ্জ। কষ্ট যা তা তো হয়েছে আমার। তার জন্যে তো আর কাউকে আফ্‌শোস করতে হবে না।

প্রধান। (চাল সাপটাতে সাপটাতে) তাই যদি বুঝবি তুই তবে আর আমার দুঃখুটা কিসের?

কুঞ্জ। থাক, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না তোমার। .... যথেষ্ট হয়েছে। কত ছলনাই জানো?

প্রধান। (স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থাকে) কী, কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকি-কান্না! আমার সহানুভূতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই!! তুই আমারে অপমান করলি—

[কেঁদে ফেলে]

কুঞ্জ। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। বুঝলে, মহা জ্বালা। অপমান আবার তোমারে করলাম কখন?

প্রধান। অপমান নয়? এর চাইতে আর কী-ভাবে তুই আমারে অপমান করতে চাস? কী-ভাবে আর অপমান করতে চাস্? তোর কাছে আমার দুঃখ, সহানুভূতি সব মিথ্যে, ছলনা! তার চাইতে তুই আমার মাথায় তুলে—

(সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বসে।
রাধিকা, মাখন চেঁচিয়ে ওঠে!)

কুঞ্জ। (ছুটে গিয়ে হাতখানা চেপে ধরে) কী হচ্ছে কী এ সব? জেঠা কী কর?

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) তুই আমারে খুন করে ফেল কুঞ্জ। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার—

[চাপা আর্তনাদ করতে থাকে]

কুঞ্জ। (কাঠ ফেলে দিয়ে) ছি ছি ছি ছি ছি ছি। রাগের মাথায় কী না কী বলেছি, অমনি—

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ, হচ্ছ তুমি দিন-কে-দিন।—কথার ভেতরে তো বলেছি যে অসুখে ভুগছে, আর তারপর ডাক্তারও বারণ করে গেছে, ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া যেন না দেওয়া হয় ওরে, তাতে করে এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসবার কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি ছি।

প্রধান। অসুখ! বলি অসুখটা কী রে ওর, য়্যাঁ—

কুঞ্জ। হাত-পা ফুলে গেছে, চোখ হলদে পানা, অসুখ না?

প্রধান। বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু অসুখটা কি খাওয়ার জন্যে, না না-খাওয়ার জন্যে, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করি।

[কুঞ্জ নিরুত্তর]

রাধি। আজ মাসখানেক হল ও তো একরকম না-খাওয়ার ওপরেই আছে। কী খায় ও?

কুঞ্জ। তা অসুখ হলে মানুষ আবার খায় কী?

প্রধান। অসুখ! অসুখ! হেঃ, অসুখ! কুঞ্জ, আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ...

কুঞ্জ। না না, ওর ভীষণ অসুখ! ডাক্তার বলে গেছে জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ। জেঠা তুমি জানো না ওর .....

মাখন। আমার খিদে। আমি খাব। আমায় খেতে দে। আমি খাব।

প্রধান। আমি ভুলতে পারবো, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ।

কুঞ্জ। জেঠা, ওর অসুখ। তুমি ভুল করছ ভেঠো, ওর ভয়ানক অসুখ। ডাক্তার বলছে ওর ভয়ানক অসুখ।

প্রধান। আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না। ডাক্তার যাই বলুক আমি ভুলব না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

কুঞ্জ। তুমি বুঝতে পারছ না জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ—

প্রধান। আমি ভুলব না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে গেল।—আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

(পটক্ষেপ)

(ঐ একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে 'বল হরি হরি-বোল' আর 'মাগো মাগো'—ধ্বনির বিরামহীন আবহ, আর্ত কণ্ঠধ্বনি। রাধিকার অসুখ। বৃক্ষ এলোচুলে সে বসে আছে দাওয়ার ওপর অসুস্থ মাখনের শিয়রে। আর বিনোদিনী ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।)

বিনোদিনী। (ঝাঁটা হাতে সামনে ঝুঁকে পড়ে রাধিকাকে) আর এই ধ্বনির যেন বিরাম নেই। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল দিবানিশি। উঃ, কি লোকটাই না মরছে!

রাধি। দেখছ কী, কিছু কি থাকল! হুঃ, উজোড় হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর না করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, এক বিন্দু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত কেউ নেই।—কী যে হবে সব!—এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনো দিন।

বিনো। (বসে পড়ে, রাধিকার প্রতি) এই রকম আকাল পড়িছিল নাকি আর একবার। অবিশ্যি, আমরা কেউই দেখিনি, মায়ের মুখ থেকে শোনা কথা বলছি। তা তিনিও আবার নিজের চোখে দেখেননি, ভাব ঠাকুরমার থেকে শুনেছেন। দিদি জানো?

রাধি। ন্-ও আ।

বিনো। (উঠে দাঁড়িয়ে) সে নাকি এর চাইতেও ভীষণ।

ঝাঁট দিতে আরম্ভ করে। রাধিকা মৃদু একটা মুখ ঝাপটা দিয়ে ঘাড় বাঁকায়।

নেপথ্যে হারু দত্তের গলা খাঁকারির আওয়াজ।

হারু দত্ত। (নেপথ্যে) ই-য়ে প্রধান?

[হারু দত্তের প্রবেশ]

—ই-য়ে গে, প্রধান আছো?

(হারু দত্তকে দেখে বিনোদিনী ঘোমটা টেনে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। রাধিকাও হারু দত্তের অলক্ষ্যে মাথায় কাপড় তুলে দিল)

রাধি। বাড়ি নেই কো।

হারু দত্ত। আরে এই যে মাখনের মা, তা প্রধান যে আমারে বলে এলে—

রাধি। (দাওয়ার ওপর একটা বস্তা পেতে দিয়ে) হ্যাঁ, বসতে বলে গেছে।

হারু দত্ত। বসতে বলে গেছে?

রাধি। হ্যাঁ, বললে বলে এই যাব আর আসব। এলে পরে বসতে দিয়ো।

হারু দত্ত। তা ফিরবে তো তাড়াতাড়ি, না কী?

রাধি। বলে তো গেছে।

হারু দত্ত। (বসতে বসতে) বসতে বলে বেরিয়ে গেল, উঁ.... তা ও শুয়ে কেডা?

রাধি। ঐ তো মাখন। আজ কদিন হয়ে গেল, এ ছেলের হাঁ না কোনো বাক্যি নেই মুখে। চোখ মুখ সব ফুলে পড়েছে। কী যে অদৃষ্টে আছে!

হারু দত্ত। উঁ—তা তোমারও কি অসুখ নাকি? বড্ড শুকনো শুকনো মন মনে হচ্ছে যেন।

রাধি। (মাথায় হাত দিয়ে) অসুখ, আজ কদিন হল একেজ্বরি হয়ে আছি। এ জ্বরের কিছুতেই বিরাম নেই।

হারু দত্ত। উঁ, তা ওষুধ-পত্তর খাচ্ছ?

রাধি। (নাকি সুরে) ওষুধ কোথায় পাব বাবা? সামান্য এট্টু পত্যি তাই বলে.....

হারু দত্ত। নিমছাল, নিমছাল। ওষুধ বলতে কি আমি আর অন্য কিছু বলছি, হেঃ। নিমছাল। বেশ করে ধুয়ে এট্টা হাঁড়ি করে না—সে তুমি আবার তা ঠিক পারবে না। কতকগুলো প্রক্রিয়া আছে। তা এখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারো কাউকে এট্টা শিশি দিয়ে।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি) তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঠায় পেছন ফিরে? বাবাঠাকুরের কাছে তোর আবার লজ্জা কিসের এত! আয় বোস!

হারু দত্ত। (হেসে) কেডা ও, নিরঞ্জনের বউ না? আরে দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো। আমি ভাবলাম বলি আর কেউ বা হবে। আচ্ছা বল মাখনের মা, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে আমার বাড়ি তোমার বাড়ি দু-বার ছেড়ে অমন দশবার করে দেখা হচ্ছে রোজ বউমার সঙ্গো, তবু এত লজ্জা! হেঃ হেঃ লজ্জা, তা ভালো, লজ্জা ভালো! বউ মানুষ কি না! তা ভালো।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি কটাক্ষ করে) ঐ তো ভাবই ঐ রকম। অথচ আপনি দেখেননি (বিনোদিনীর দিকে ভেংচি কেটে দত্তের দিকে এমন মুখ করল যে বিনোদিনী কতই মুখরা) তা দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানো তল্লা বাঁশের মতো, বোস্ এখানে এসে। বাবাবাঠাকুর যে তোর বাপপিতেম'র সমতুল্য।

(চোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে জ্বলে ওঠে বিনোদিনীর। একটু ইতস্তত করে বিনোদিনীর দ্রুত প্রস্থান)

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি শ্লেষের ভঙ্গিতে দত্তকে) দেখলেন তো?

হারু দত্ত। হেঃ হেঃ ছেলেমানুষ কিনা!—তা দিয়ো যেন পাঠিয়ে এট্টা শিশি দিয়ে। একেজ্বরি হয়ে থাকা ভালো কথা না। দিনকাল বড়ো খারাপ, বড়ো খারাপ। এমনিই দেখছ তো সব চারদিকে—

রাধি। তা আর দেখছি নে! ভয়ে বলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

হারু দত্ত। (চোখ কপালে তুলে) উঁ—

[প্রধানের প্রবেশ]

এই যে এয়েছো।

প্রধান। (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) এই এট্টু দেরি হয়ে গেল. আর—তা এয়েছেন কতক্ষণ?

হারু দত্ত। তা-া অনেকক্ষণ হল। বসে আছি তোমার জন্যে।

প্রধান। (মাথা চুলকে) দেখুন দিনি। বসতে বলে গিছলাম কিন্তু।

হারু দত্ত। হ্যাঁ, তা শুনেছি। .... তারপর? কী ঠিক করলে?

প্রধান। ঠিক মানে .... বলব বা কী!

হারু দত্ত। ঠিক মানে....বলব বা কী!

হারু দত্ত। সে আবার কী। তা (হাত তুলে) বলি বিক্রি তো করবে, না কি! মনোগত অভিপ্রায়টা কী তাই খুলে বল। জোর করে তো আর আমি তোমারে জমি বেচে ফেলতে বলছি নে!

প্রধান। তো রন্ এট্টু বসুন, কুঞ্জ আসুক।

হারু দত্ত। কুঞ্জ আসবে!

প্রধান। হ্যাঁ, এই এল বলে।

হারু দত্ত। তা কুঞ্জরে দিয়ে আমি কী করব? তার সঙ্গো আমার তো কোনো দরকার নেই। আর আলাপ আলোচনা, আগে কি এ সম্বন্ধে তার সঙ্গো তোমার কোনো কথাবার্তাই হয়নি?

প্রধান। কথাবার্তা—আর কী বা এমন বিশেষ, তবে হ্যাঁ বলিছি।

হারু দত্ত। বলেছ?

প্রধান। হ্যাঁ বললাম বলি জমি-জায়গা যখন—

হারু দত্ত। তা যাগ্‌গে সে তুমি বোঝোগে ; আমি আর সে কথা শুনে কী করব? তা.... কুঞ্জ কী বল্লে?

প্রধান। বললে .....

হারু দত্ত। বলো. বলো।

প্রধান। কুঞ্জ তো বারণ করে ; বলে যে না থাক দরকার নেই জমি বেচে ও দরে।

হারু দত্ত। বারণ করে, উ—উ—উ, তা তুমি কী বল?

প্রধান। আ—মি বলি, এখন কথা কী জানেন—

হারু দত্ত। দ্যাখো প্রধান, এট্টা কথা বলি। কারবার তোমার সঙ্গো আমি এই নতুন করছি নে। আর তুমিও তো জান আমারে না কী? এই যে মগরার বিলের জমি বিক্রি করলে সেদিন, হিসেব করে দ্যাখো, আর পাঁচজনই বা ঐরকম জমির কী দর দিয়েছে, আর আমিই বা তোমারে কী দর দিইছি! যাচাই করে দ্যাখো! আর এই যে কিনছি আমি, বলতে গেলে এ তো আমার একরকম লোকসান। মরলোক তো আর কিছুই আমার হাতে আসছে না। বলবে আবাদি জমি, কিন্তু এখন তো অনাবাদি-ই হয়ে রইল। হাল তো আর আমি ধরতে যাচ্ছি নে জমিতে! থাকল পড়ে এখন ঐ অবস্থায়! মাঝখান থেকে খামখা কতকগুলো টাকা আমার গাঁটগচ্চা চলে গেল। তো এর ওপর আমারে আর কত লোকসান দিতে বল তুমি?—এই যে সব সাহায্যের কথা শুনি, চাল দিচ্চে, ডাল দিচ্ছে, খিঁচুড়ি খাওয়াচ্ছে, বস্তুর দিচ্ছে সব ভদ্দরলোকেরা, সত্যি কথা বলতে গেলে এ-ও তো আমার একরকম সাহায্য ; মাটির বদলে টাকা দিচ্ছি। কী দাম আছে মাটির আজ বল তো? অবিশ্যি হ্যাঁ, ছাগল তোমার, এখন সে তুমি মাথার দিকেই কাটো, ন্যাজের দিকেই কাটো, আমি বলতে

যাব না। তবে ঐ, ওর বেশি আর আমি এখন এক আধলাও দিতে পারব না। অসম্ভব এট্টা কথা বললেই তো আর হয় না।

[কুঞ্জর প্রবেশ। মাথায় এক বোঝা ঘাস]

এই যে কুঞ্জ এয়েছো—তা ও ঘাস আনলে কোত্থেকে?

কুঞ্জ। এই পাঁচ জায়গা ঘুরে ঘুরে।

হারু দত্ত। উঁহু, এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।

কুঞ্জ। না, এই তো দুগাছা নিইছি।

হারু দত্ত। তা সে ঐ দুগাছার দামই অতি কম এখন আটগণ্ডা পয়সা। আর কেটো না।—তা হলে আমাদের এদিকে কী হল প্রধান? কবালা করছ কবে তাই বলো। কাল সময় হয় না তোমার?

কুঞ্জ। (দত্তের দিকে কটাক্ষ করে) কিসের কবালা, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। (হেসে) দ্যাখো দ্যাখো কী বলে পাগল। তা সে ঘাস জমি আমি তোরে দেবখন। জমিতে ঘাস ছাড়া এখন আর কী জন্মায় রে আহাম্মক? হেঃ, নিসকোন্ তুই ঘাস।

কুঞ্জ। না তা সে আপনি যাই বলুন, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। বলি হ্যাঁ রে, জমি ধুয়ে খেয়ে কি পেট ভরবে, য়্যাঁ? য়্যাঁ-হ্যা—হ্যা—হ্যা জমি বিক্রি নেই।

কুঞ্জ। না, তা সে বললে কী হবে—

হারু দত্ত। (হেসে) তুই চুপ কর। ছেলেমানুষ তুই, জমির কী বুঝিস, রে।—তা হলে প্রধান ঐ কথাই থাকল, কী বল?

কুঞ্জ। তা ও জেঠা কী বলবে? বলছি বলি জমি বেচব না, তা আপনি সে একেবারে জোঁকের মতো লেগে আছেন সদাসর্বদা জেঠার পেছনে। ও জমি বিক্রি হবে না।

হারু দত্ত। হেঃ, হেঃ, হেঃ, তোমার ভাইপোটি, বুঝলে প্রধান, একেবারে মাথা খারাপ ; কোনো দিকে হুঁস নেই। —এই তো শুনলাম আজ কদিন থেকে ভুগছে অসুখে মাখনের মা। কেন, দু'পা এগিয়ে গিয়ে (কুঞ্জের প্রতি) আমার জ্বরঘ্ন পাঁচনটা নিয়ে আসতে তোমার কী হয়, কী হয়? যাবি বুঝলি, নয় তো আর কাউকে পাঠিয়ে দিস্ বলে গেলাম।

কুঞ্জ। অসুখ অনাহার, তা ওষুধ দিয়ে কী হবে?

হারু দত্ত। অসুখ অনাহার। হেঃ হেঃ, তোমার ভাইপোটি বুঝলে প্রধান, বড্ড রসিক তো! ভালো ভালো কথা বলে বেশ কুঞ্জ!.... তা হলে ঐ কথাই থাকল প্রধান।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রধান। না, থাক জমিটুকু বাবা, থাক। আর সবই তো গেছে, জমিটুকু আর বেচব না।

হারু দত্ত। আচ্ছা তো নিয়ো'খন পুরিয়েই।

প্রধান। না থাক্।

হারু দত্ত। আবার কী থাক্, পুরিয়েই নিয়ো'খন।

প্রধান। কুঞ্জ!

কুঞ্জ। টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।

প্রধান। তাই বলব—না, ও বেচব না বাবা থাক্।

হারু দত্ত। বেচব না!—কথার খেলাপ করো না হে প্রধান.....কথার খেলাপ করো না।

কুঞ্জ। বলি খেলাপের কথা ওঠে কিসে, হ্যাঁ গো মশায়? ওঠে কিসে খেলাপের কথা? দুঃস্থ অভাজনের ওপর অনাহক এরে বলে কী অত্যাচার। জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না ; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।

প্রধান। (কুঞ্জুকে বাধা দিয়ে) আ-হ-া, তুই চুপ কর, দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (চেঁচিয়ে) কেন চুপ করার কী হয়েছে? চুপ করবে! এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।

প্রধান। তা সে যাই যাব, তুই চুবো।

কুঞ্জ। কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, —চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

প্রধান। আ-হা-া, তুই চুপ করে দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। চুপ করবে!

হারু দত্ত। কথার যে বড় পাঁয়তাড়া দেখি, উঁ?

কুঞ্জ। তবে, এখনও ভয় করে চলতে হবে। এখনও ভয়?

হারু দত্ত। উঁ, তা সে আমারে ভয় না করে—

[ওপরে হাত তোলে]

কুঞ্জ। জানি, জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে ; ওতে আর ভয় করি নে।

হারু দত্ত। উঁ, সোজা শিরদাঁড়টা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয় ; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্ধা!

কুঞ্জ। এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।

[হারু দত্তের ছোট মেয়ে মাতির বেগে প্রবেশ]

হারু দত্ত। (মেয়েকে সামলে) ছোটলোক গালাগালি হল? বেটা হারামজাদার কথা শোনো ছোটলোক গালাগালি হল?

কুঞ্জ। এই মুখ সামলে কথা বলো বিস্তুক।

হারু দত্ত। দে-দ্যাখো একবার—

মাতি। (আর্তকণ্ঠে) বাবা!

হারু দত্ত। যা তো মাতি, ডেকে নিয়ে আয় তো তোর মামারে, আর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যারা যারা আছে। যা—

[মাতির দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। তা আপনি যান বাবা! এক তো জমি, তা সে আমি বিক্রি করব না ফুরিয়ে গেল!

হারু দত্ত। না অত সহজে ফুরিয়ে যায় না, অত সহজে ফুরিয়ে যেতে দেব না।

প্রধান। খামখা কথা বাড়াচ্ছেন বাবু আপনি?

হারু দত্ত। কথা বাড়াচ্ছি আমি, উঁ, বুড়ো হলেও তুমি তো দেখেছি একটি কম খচ্চর নও প্রধান।

কুঞ্জ। (আস্ফালন করে) হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

কুঞ্জর বেগে প্রস্থান। মঞ্চের অপর দিক থেকে লাঠিসহ দু তিনজন বলিষ্ঠ লোকের প্রবেশ

হারু দত্ত। দে তো রে আচ্ছা করে ঘা দু-চ্চার

(লাঠি হাতে কুঞ্জর বেগে প্রবেশ। কুঞ্জর লাঠির ওপর লাঠির ঘা পড়ে। মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। একজন প্রধানকে আগলে রাখে)

১ম ব্যক্তি। (কুঞ্জের প্রতি) শালা না খেয়ে মরতে বসেছ, এখনও তেলানি গেল না!

২য় ব্যক্তি। এই পায়ে ধরে মাফ চা। চা মাফ!

(কুঞ্জ বুকে হেঁটে হারু দত্তের পা ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়।
হারু দত্ত দু-পা পিছিয়ে দাঁতে পিচ কাটে)

হারু দত্ত। পায়ে হাত দিস নে, পায়ে হাত দিস নে, য়্যাঁ ঃ।

(বিনোদিনীর প্রবেশ। বারান্দার ওপর অসুস্থ মাখন উত্তেজনায় উঠতে গিয়ে ঘুরে পড়ে যায়। রাধিকা ও বিনোদিনী আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে।)

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কার সঙ্গে কী কথা বলিস্ ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানাহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধি। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

[আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুঁই শব্দ করতে থাকে]

প্রধান। মাখন, মাখন রে (- (-ঃ, —কুঞ্জ দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

(পটক্ষেপ)

৮৬.৮ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক)

'নবান্ন' নাটকটি চার অঙ্কে পনের দৃশ্য নিয়ে পরিকল্পিত হলেও অভিনয় কালে ১৪টি দৃশ্য ব্যবস্থা করা হোত। মূল নাটক প্রথম প্রকাশকালের পাঠ (অরণি), এর সঙ্গে সম্পাদিত অভিনয় কপি (Prompter কপি) ও মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে শ্রীসুধী প্রধান নানা প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ও প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তা সত্ত্বেও কাহিনীর তেমন কোন হেরফের হয়নি।

নাটকের ঘটনাস্থল আমিনপুর গ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটি সামলিয়ে গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষ একটু আত্মস্থ হয়েছে যেই, অমনি নেমে আসে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বগ্রাসী বন্যার তাণ্ডবে আর দুর্দান্ত ঝোড়ো হাওয়ায় গৃহস্থের মাথার উপরের চালটা যায় পড়ে। আমিনপুরের পায়ের নিচের শক্ত মাটিটা যায় সরে।—'থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হ'ল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে, —প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

[প্রধান ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

সমস্ত আমিনপুর সর্বনাশা বন্যার কবলে চলে গেছে। ভেসে গেছে ঘর বাড়ি, মানুষজন, —'প্রধান, সমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল....সমুদ্দুর উঠে এয়েচে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

[দয়াল ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

গোটা আমিনপুরের জীবনের শতরঞ্জিটা ছিড়ে শতছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশার একচ্ছত্র রাজত্ব হয়ে গেছে আমিনপুর।—জীর্ণ গৃহ-পরিবেশ। খসে খসে পড়ছে চালা। কোনো কোনো জায়গায়

খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকালটুকু দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট।'

[দৃশ্য বর্ণনা, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

আমিনপুরের গ্রামে এই দুর্দশাগ্রস্থ প্রধান সমাদ্দারের পরিবার বন্যার কবলে পড়ে যখন ধুঁকছিল, তবুও পড়েছিল আমিনপুরের মাটি কামড়িয়ে। কিন্তু গ্রামের পয়সাওয়ালা লোভী ধূর্ত হারু দত্ত ও তার লোকজন এসে এই অসহায় পরিবারটার ওপর চালায় নিষ্ঠুর অত্যাচার। শেষ সম্বল একটুখানি জমি অল্প দামে কিনে নেওয়ার জন্য এসে যখন কুঞ্জর কাছে বাধা পায়, তখন তার জমির লোভটা নেকড়ের আক্রোশে পরিণত হয়। লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। —'মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। ..... লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে। ..... কুঞ্জর কান্না আরো জোরাল হয়। রুগ্ন মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

[প্রথম অঙ্ক, 'পঞ্চম দৃশ্য]

কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারে না মাখনকে। কুঞ্জ রাধিকার একমাত্র সন্তান, দস্যুর হাতে বাপ ঠাকুরদার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের আতিশয্য সহ্য করতে না পেরে ভয়ে আতঙ্কে অনতিক্ষণ পরে প্রাণ হারায়। সমাদ্দার পরিবার তার একমাত্র বংশধরকে হারিয়ে হাহাকার করে ওঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। আর তখন, 'ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখ মুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।' এই ইঙ্গিতময় বিবরণটুকুর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় সমাদ্দার পরিবারের ভবিষ্যৎ। গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথ বেয়ে বাঁচবার মরণান্তিক প্রয়াসের আভাসটুকু ফুটে ওঠে বিনোদিনীর ভাবনায়।

৮৬.৯ মূলপাঠ ৩ — নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কালীধনের গদী। উঁচু একটা ফরাসের এক কোণে মোটা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে কালীধন। মোটা কালো নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ে একটা ফতুয়া—গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিকৃতি। নিচে দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের গোলা দিয়ে বিচিত্রিত শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই বারবার করিতেছি।" পাশে লাল কাপড়ে বাঁধাই করা স্তূপীকৃত খাতাপত্র। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লা। আধমণ, দশসের, পাঁচসের, আড়াই সের ও এক সের ওজনের লোহার বাটখারাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গুদাম ঘরের একপাশে কতকগুলো খালি বস্তা সাজানো। কুলি ও বাবু গোমস্তা এধার-ওধার ঘুর-ঘুর করছে। সামনে দিয়ে চলেছে সব ভারবাহী কুলিরা, পিঠে তাদের সব দু-মণি চালের বস্তা। মাল সব গুদোমের চোরকুঠু রিগুলোতে চালান করে দেওয়া হচ্ছে হরদম। ক্যাশ বাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কালীধন মাঝে

মাঝে কী সব হিসেবপত্তর করছে, আর বিড় বিড় করছে। সামনে ফরাসের এককোণে সপ্রতিভ হয়ে বসে আছে হারু দত্ত ; পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। বিড়ি ফুঁকছে আর কালীধনের দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। কী একটা হিসেব কষা চলছে যেন সামনের খাতায় ; আর তারই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করছে উভয়ের চোখেমুখে। ফরাসের ডানদিকের এককোণে মাছির মতো ডুবে আছে রাজীব, দোকানের বৃদ্ধ কর্মচারী, নথিপত্তরের মাঝখানে। এমন সময় একজন ছোকরা গোমস্তা, নিরঞ্জন ওরফে রাখহরি চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে কালীধনের দিকে এগিয়ে এল।)

নিরঞ্জন। মাল সব গুদোমে উঠে গেছে।

কালীধন। ঠিক মতো তোলা হয়েছে তো?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ সে—

কালীধন। একেবারে—

[চোরকুঠুরির দিকে আঙুল তুলে খোঁচা মারলে]

নিরঞ্জন। তিন নম্বর কামরায়।

কালীধন। তিন নম্বর। ঠিক আছে।—এইবার তুমি দ্যাখো, দ্যাখো আবার ওদিকে দ্যাখো। দ্যাখো। (হিসেবের খাতায় মন দেয়) চাবিটা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এই তালাটা দিয়ে আসি!

কালীধন। দিয়ে আসি! এখনও লাগাওনি! কতবার করে বলতে হবে—নাঃ, আর চলল না কারবার।

[নিরঞ্জন প্রস্থানোদ্যত]

এদিকে শোনো। বললাম আর চললে অমনি হড়বড় করে। ভালো করে টেনে দেখো তালা ; আর বেরিয়ে আসবার সময় দু'খানা বস্তা টেনে দিয়ো খাদের মুখে, বুঝতে পেরেছ? যাও।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

সব দেখে-শুনে করবে, এ সব কথা কি আর বার বার করে বলে দিতে হয়। ঝটপট সেরে এসে (নিরঞ্জনকে উদ্দেশ করে হারু দত্তের প্রতি) এদের নিয়ে কারবার চালাতে হয়। বলব কী তোমায় সে একেবারে ষাঁড়ের গোবর, কোনো কম্মেরই হোক! (নিম্নস্বরে) রেখেছি শুধু লোকটা বিশ্বাসী বলে। কেটে ফেলে দাও, এট্টা কথা তুমি বের করতে পারবে না মুখ দিয়ে।

হারু দত্ত। সে তো মস্ত গুণ।

কালীধন। রেখেছিও তো ঐ জন্যেই।

হারু দত্ত। আজকালকার দিনে একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে—

কালীধন। (এক নজর তাকিয়ে ভ্রু তুলে) নিশ্চয়। (সঙ্গে সঙ্গে হিসেবে মনোনিবেশ করে, ঠোঁট দু'খানা নড়তে থাকে) তা হলে তোমার হল গিয়ে একুনে—আচ্ছা একটু সবুর করো, আসুক রাখহরি। আরে কই রে....(হিসেবে মন দেয়) বিড়ি খাও।

হারু দত্ত। হ্যাঁ সে—(বিড়িতে টান মারে) আমার আবার ওদিকে একটা কাজ ছিল!

কালীধন। আরো এসো। (দেশলাই দেয়। হিসেব কষে একটু পরে) চাল কিন্তু তোমার এবার তেমন সরেস নয় দত্ত!

হারু দত্ত। আর সরেস, দুদিন বাদে আর চালই পাও কি না তাই দ্যাখো, তার আবার...। এই তাই যা অবস্থা হয়ে উঠেছে মফস্বলে.....একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার। অ্যাঁ....

[প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকে কালীধনের দিকে]

কালীধন। বুঝলাম, কিন্তু তোমার গিয়ে নন্দীদের ঘরে যে চাল দিচ্ছে সে কোত্থেকে! বেশ সরেস চাল! সে একটা চাল তুমি ভাঙা বা অন্য কিছু পাবে না।

হারু দত্ত। হ্যাঁ জানি, কিন্তু দর দিচ্ছে কত করে খবর রাখ!

কালীধন। কত!

হারু দত্ত। সাড়ে বাইশ। দেবে! দেবে!

কালীধন। সাড়ে বাইশ!

হারু দত্ত। তবে, বালাম কি আর মাঙনা হয়!

কালীধন। সাড়ে বাইশ অবিশ্যি বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। তা ভালো জিনিশের ভালো দর দিতে হয়। নইলে হবে কেমন করে।—বলো তো দেখিএকবার চেষ্টা করে দু'দশ নৌকো যা পাই। তবে দর ঐ সাড়ে বাইশ, তেইশ, ওর এক আধলাও কিন্তু কম নয়। হয় তো বলো!

কালীধন। না ও দর দিতে পারব না। অনর্থক মার খেয়ে যাব।

হারু দত্ত। কী মার, লুফে নিয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশে। নন্দীরা কি লোকসান দিচ্ছে!

কালীধন। না সে নন্দীরা যাই করুক, আমি ও দর দিতে পারব না। বাজারের কথা এখন কিছু বলা যায় না দত্ত, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলেছে। ওরে ব্বাপ্‌রে বাপ রে....

হারু দত্ত। (খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে) এই তো দ্যাখো, তোমরাই যদি এই রকম কথা বল তো আর সব কারবারিরা যায় কোথায়!

কালীধন। না না দত্ত তুমি বোঝ কী! নিদেনপক্ষে এখনও সওয়া লাখ টাকার মাল আমার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অন্তত এই টাকাটা উশুল না হয়ে আসলে....

হারু দত্ত। তা সে উশুল হয়ে যাবে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। সেই কি আর এট্টা কথা হল।—তুমি তো বলছ হয়ে যাবে, কিন্তু এই না হওয়া পর্যন্ত —রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে দত্ত, তুমি বল কী! খালি আজে বাজে কত কথা কত কী সে একেবারে ভীমরুলের চাকের মতো চারদিক থেকে এসে পাগল করে দেয়।

হারু দত্ত। বুঝতে পাচ্ছি ব্লাড প্রেসার হয়েছে।.... তা সে বড়ো বড়ো লোকের আবার ও সব না থাকলে চলে না।

কালীধন। (হেসে) তা যা বলেছ—

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

এই যে এয়োছো এতক্ষণে!

হারু দত্ত। হ্যাঁ তো ন্যাও এইবার এট্টু তাড়াতাড়ি করো। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার আবার ওদিকে।

কালীধন। সব টাকা কিন্তু আজ দিচ্ছি নে।

হারু দত্ত। সে কী—তো দ্যাও ; যা দেবে দ্যাও ; আমার আবার ওদিকে—

কালীধন। (হেসে) গুঁইবাবুদের ঘরে যাবে নাকি আজ! সে সব তো শুনলামই না। আর আসই একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে তার শুনব কখন! দু-দণ্ড বসে যে এট্টু বাজারের হালচাল সম্বন্ধে দুটো কথাবার্তা বলব—(নিরঞ্জনের প্রতি) কই, কী বললে, ক বস্তা হয়েছে!

নিরঞ্জন। ঐ পুরোপুরি 'সাতশ বস্তা।

কালীধন। সাতশ' বস্তা। এখন একগাড়ি—

হারু দত্ত। তুমি আগে আমারে যা দেবে তাও তো, তারপর সে তোমরা বসে সব হিসেব-পত্তর করোগে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। (চাপা ধরা গলায়) আচ্ছা তা হলে তোমারেই আগে দিয়ে দেই। তোমারেই আগে দেই। ক্যাশবাক্সের ভেতর থেকে একতাড়া নোট বার করে হারু দত্তের হাতে গুনতি করে দেয়। গুণে ন্যাও।

হারু দত্ত। (গুনতি করতে করতে) আবার গুনতে হবে। পাঁচ-দশ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার, আর.... এতে কত দিলে!

কালীধন। আর পাঁচশো —

হারু দত্ত। আর পাঁচশো। এই দিলে এখন।

কালীধন। হ্যাঁ, হিসেব সে এখন তোমার থাকল।

হারু দত্ত। (এস্তে) তো থাক, থাক, তোমার কাছে হিসেব থাকবে তাতে আর আচ্ছা আমি চললাম। (উঠতে উঠতে) বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাজারেই বা যাব কখন, কেনাকাটারই বা কী করব! —তো চললাম, আর ও কথার কী বললে! দেখব নাকি বালাম!

কালীধন। বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। রাখলে পারতে কিছু , জিনিস ভালো ছিল। আর হয় তো পাবেই না।

কালীধন। জিনিস ভালো, দরও তো ভালো। আর কথা কী জানো, ওতে তেমন কিছু থাকে না। তুমি আমার বরং এই চালটাই আরও কিছু—

হারু দত্ত। তা সে তো বলেই গেলাম, তবে এটাও কিছু রাখলে পারতে।—তা সে বোঝ গে তুমি, আমি কিছু বলতে চাইনে—আমার আবার এদিকে.....

কালীধন। তা বলছ যখন এত করে, দিয়ো কিছু।

হারু দত্ত। কত?

কালীধন। কত দেবে!

হারু দত্ত। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) এই।

কালীধন। (বিস্মিত ভঙ্গিতে) অত!.... তা দিয়ো, দিয়ো।

হারু দত্ত। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ রেখে তো দ্যাও কিছু, তারপর এখন বোঝা না হয়, আচ্ছা আমি চলি তা হলে।

কালীধন। আচ্ছা—। (চেঁচিয়ে) আরে ইয়ে দত্ত। তারপর, ভালো কথা, আমার সেই জিনিসের কী করলে। আমার সেই জিনিস!

হারু দত্ত। কোন্ জিনিস বলো তো?

কালীধন। জিনিস, আবার বলতে হবে কোন জিনিস!

[সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে আবার হারু দত্ত]

হার দত্ত। (কৌতূহলী হেসে) কী বল দিনি, ও হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তা সে হবে, হবে। ব্যবস্থা আমি সে ওদিকে একেবারে পাকাপাকি করে ফেলেছি। ঠিক হয়ে যাবে সব।

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীধন। ঠিক তো—

হারু দত্ত। এই দেখবে হয় তো ফিরে পাকেই—

[ফিরে চেয়ে হাসল]

কালীধন। সত্যি, মাইরি

হারু দত্ত। তবে—

কালীধন। আচ্ছা-া-া-া

[হারু দত্তের প্রস্থান]

(ক্যাশবাক্সের ডালাটা তুলে ধরে কালীধন যেন কি সব নাড়াচাড়া করে, তারপর একটা

লম্বা চাবি বের করে একটু ফিরে শুয়ে পাশের লোহার সিন্দুকটা খুলে ক'তাড়া নোট ভেতরে চালান করে দেয়।)

রাজীব। (হাই তুলে তিন তুড়ি বাজিয়ে) রাধে গোবিন্দ বল মন।

কালীধন। সরকার মশাই।

রাজীব চশমার ফাঁক দিয়ে কালীধনের দিকে এক নজর তাকিয়েই নিজের কাজে মন দেয়।

ও সরকার মশাই।

রাজীব। কইয়্যা ফ্যালাও, শুনত্যাছি।

কালীধন। চালানটা পাঠিয়েছিলেন ও বেলা?

রাজীব। (একদৃষ্টে কালীধনের দিকে তাকিয়ে) বিপিনবাবুর নামে তো? চব্বিশ নম্বর!

কালীধন। (খাতা দেখে) হ্যাঁ।

রাজীব। হ হ দিছি, রাখহরিরে দিছি। তাইলেও একবার জিগাও, পাঠাইল কি না চালানটা।

কালীধন। এই তো দেখুন গণ্ডগোল বাধান।

রাজীব। গণ্ডগোলের আবার কী আছে ইয়ার মধ্যে ; হ্যাঁ হে মহে—আরে কী যে কয় ওয়ার নামটা, রাখহরি রাখহরি। রাখহরি, চালানটা নি পাঠাইছ বিপিনবাবুর?

নিরঞ্জন। (কাজ ফেলে এগিয়ে যায়) নম্বর কত চালানের?

[জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কালীধন। নম্বর কত চালানের! এখন জিজ্ঞেস করছ নম্বর কত চালানের! নাঃ, কাজ-কারবার আর —(সহসা ভদ্রলোকের প্রতি) আপনি—

ভদ্রলোক। আমি—

কালীধন। ও বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। মণ্টুবাবুর বাড়ি থেকে আসছেন তো—তা একটুখানি বসতে হবে আপনাকে ; এই বেশিক্ষণ না, একটুখানি বসুন—

[আগন্তুক ভদ্রলোক পাশের চেয়ারে বোকার মতো বসে পড়লেন।]

(নিরঞ্জনের প্রতি) তা যাও, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এখন করবে কী। যা হবার তা তো হয়েইছে। কালও যায়নি, আজও গেল না চালানটা।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

(রাজীবের প্রতি) আর আপনিও তেমনি দিয়েই খালাস। দিলেন যখন তখন আর একবার খোঁজ করে দেখলেই পারতেন যে চালানটা ঠিক পাঠানো হল কি না। সবাই যদি এখন—

রাজীব। আরে দিয়া তো রাখছি সেই কোন সকালে, তা সে যে পাঠায় নাই এহনতরি—

কালীধন। আহা দিছলেন তো বুঝলাম সকালবেলাই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক পাঠানো হল কি না, মাঝে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলেই পারতেন, চুকে যেত।

রাজীব। অহন জট তো আর নাই আমার মাথায়—

কালীধন। জট থাকা না থাকার কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না। যাগ্‌গে, খামখা আপনার সঙ্গো তর্ক করে আর—(ভদ্রলোকের প্রতি) এইবার বলুন কী বলছিলেন আপনি। ও হ্যাঁ, আরে ওহে, সকাল বেলা আজ অনন্তধাম থেকে কোনো লোক এসেছিল কি? সরকার মশাই খবর রাখেন?

রাজীব। অনন্তধাম থাইক্যা, হ্যাঁ আইছল তো চাউলে লাইগ্যা! তা পরিমাণের কথা—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) ক-মণের কথা বলেছিলেন যেন আপনি?

রাজীব। আচ্ছা রও দেখি একবার খাতটা, লিখা তো রাখছিলাম।

[খাতায় মনোনিবেশ করে]

ভদ্রলোক। আমি মানে, এই গিয়ে আপনার একজন সাধারণ গেরস্ত লোক মশাই, বড্ড দায়ে পড়ে এসেছি। অবিশ্যি, আপনি দর যা চাইবেন আমি তাই দেব। তবে—এই কিছু চাল আমার চাই-ই।

কালীধন। (হাত উলটে) চাল কোথায় মশাই! দশ-বিশ বছরের বাঁধা খদ্দের তাদেরই বলে চাল দিতে পাচ্ছি নে, তার আপনি তো—না মশাই ও সুবিধে হবে না। আপনি বরং অন্য জায়গা দেখুন—কী কাণ্ড!

ভদ্রলোক। দেখুন দাম আমি—

কালীধন। আহা দামের কথা তুলছেন কেন অনর্থক ; দামের জন্যে তো আটকাচ্ছে না, আসলে চালই নেই।

ভদ্রলোক। চাল নেই তা হলে—

কালীধন। তা হলে দেখুন, অন্য জায়গা দেখুন।

ভদ্রলোক। বলুন কোথায় দেখব। এর আগে দু-পাঁচ দোকান যা দেখলাম, তাতে সবাই তো ওই এক কথাই বলে—চাল নেই। এখন আমি কী করি বলুন তো। আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না আমার প্রয়োজনটা। গুচ্চার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মশাই শহরে বাস। ঘরে এক দানা চাল নেই। আপনি বুঝতে পারছেন!

কালীধন। বুঝলাম মশাই, সব বুঝলাম। কিন্তু আমি তার কী করতে পারি বলুন!

ভদ্রলোক। (করজোড়ে) যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন ; আপনি বাঙালি, আমিও বাঙালী।

কালীধন। তা দামের কথা বলছিলেন, কী দর দেবেন আপনি সেটা বলুন ; দেখি যদি অন্য কোনো দোকান থেকে বলে কয়ে জোগাড় করতে পারি।

ভদ্রলোক। দর—তা সে আপনি যা বলেন!

কালীধন। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) দেখুন, দিতে পারবেন! হয় তো দেখি কারো ঘরে যদি চাল থাকে।

ভদ্রলোক। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কত! প-ঞ্চা-শ টাকা।

রাজীব। (মুখ তুলে) অনর্থক কথা বাড়াও তুমি কালীধন। খ্যাদাইয়া দাও না, হুঁঃ।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) তবেই বুঝুন!

রাজীব। চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে। দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) দেখুন, দাম শুনেই চমকে উঠলেন তো! তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে আপনি চাল নিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক। তাই বলে মশাই পঞ্চাশ!

রাজীব। আরে ষাট টাকা দরে মশায় সাধাসাধি, বোচ্চেন সাধাসাধি। আপনে তো পঞ্চাশ টাকা শুন্নাই চম্‌কাইয়া ওঠলেন।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) চাল চান অথচ দেখুন—

ভদ্রলোক। আপনি হাসছেন!

রাজীব। তো কি কাঁদবে নাকি! কী আশ্চর্য!

ভদ্রলোক। আগে ত্রিশ টাকা দরে নিইছি, এখন নয় পঁয়ত্রিশ, জোর চল্লিশই নিন। সের পনেরো চাল অন্তত আমায় দিন যে করে হোক, বড্ড ঠেকে গেছি।

রাজীব। আরে দ্যাহ কয় কী, য়্যাঁ, কয় কী! মানুষের ব্যবহার দেইখ্যা, আর—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) মাফ্ করবেন আমি পারব না।

ভদ্রলোক। (হাত জোড় করে) সের পনেরো চাল আমায় অন্তত—

রাজীব। দে দ্যাখ্ছ, বসপ্যার দিলে শুইব্যার চায়। আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।

ভদ্রলোক। (ক্ষুব্ধ স্বরে রাজীবের প্রতি) আপনি চুপ করুন। অনেকক্ষণ থেকে আমি দেখছি আপনি—

রাজীব। দে দ্যাখ—আবার চোখ ভ্যাট্‌কায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দেচে রাখহরি—

ভদ্রলোক। খুনে যেন কোথাকার। তোমায় আমি পুলিশে দেব, দাঁড়াও।

কালীধন। যান যান, আপনি বরং তাই ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে, যান যান।

ভদ্রলোক। (ক্ষোভের সুরে) অনন্তধাম থেকে লোক আসলে যত ইচ্ছে তত মণ চাল দিতে পারেন, কিন্তু

কালীধন। অনর্থক চেঁচাচ্ছেন। চাল নেই, চাল আপনি পাবেন না।

রাজীব। (খল হেসে) আরে এগুলা কি পাগল কি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। (কালীধনকে উদ্দেশ করে ভদ্রলোককে) বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখ্‌প্যার পারে তা নি জানো। আহাম্মক কোহানকার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়!

(নেপথ্যে 'মাগে' 'মাগো' ধ্বনি! কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে শুধু খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে।)

ভদ্রলোক। (রেগে) আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, কিন্তু এর কোনো প্রতিকার হয় কিনা আমি একবার—(হঠাৎ অসহায়ভাবে ভেঙে পড়ে)

[কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসে]

কিন্তু কী-ই বা করব!

[প্রস্থান]

রাজীব। (হিসেবের খাতাটার দিকে এক নজর তাকিয়ে) দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালি যত সব, মরবার আইস্যা পড়ছে শহরে—দোকানের ফটকটা বন্ধ কইর‍্যা দেচে রাখহরি, বন্ধ কইর‍্যা দে।

[নেপথ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফটকের কোলাপর্সিবল্ গেট বন্ধ করার শব্দ—
ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝট]

(পটক্ষেপ)

একটা পার্কের অংশ। কোণে একখানা বেঞ্চ পাতা। ভেতরে কুড়ি-পঁচিশ জন ভিক্ষুক ভিড় করে বসে আছে। কলকণ্ঠে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ। ভিড়ের মাঝখানে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা ও বিনোদিনীকে দেখা যাচ্ছে। প্রধান একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। রাধিকা বসে বসে মাথার চুলে বিলি দিচ্ছে। কুঞ্জ গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। বিনোদিনীকে ফষ্টি নষ্টি করতে দেখা যাচ্ছে অন্য একজন ভিখারিনীর সঙ্গে। বস্তাবন্দী ঘর সংসার—মেটে হাঁড়ি, টিনের কৌটা—সব ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্তত। বুড়ো-হাবড়া, জোয়ান, কিশোর শিশু—বিভিন্ন বয়সের নিঃস্ব জমায়েত হয়েছে এখানে, এদের ভেতরে কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ বা তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। হৈ চৈ চেঁচামেচির মাঝখানে অডিটোরিমের ভেতর থেকে জনৈক সাহেবি পোশাক পরা প্রেস-ফটোগ্রাফার শিশু সন্তান কোলে জনৈক ভিখারিনীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, ফাইন মডেল। (বন্ধুকে উদ্দেশ করে) মিস্টার মুখার্জ্জি, আরে এসো এসো, ক'খানা ছবি তুলে ফেলি। আমাদের কাগজের জন্যে। এমন মডেল তুমি চট করে পাবে না হে, এসো এসো।

(আর একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে অডিটোরিয়াম থেকে।)

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, দাঁড়াও আসছি।—দারুণ স্ট্রাইক করেছে তো হে তোমার মাথায়। আমি ভাবতেই পারিনি। ওঃ—

(দুজনে স্টেজের ওপরে গিয়ে উঠল। প্রথম ফটোগ্রাফার মঞ্চের সামনের দিকের বাঁ কোণ থেকে ক্যামেরাটা তুলে ধরে তাক করতে লাগল নিঃস্বদের দিকে।)

তুললে? ক'খানা?

১ম ফটোগ্রাফার। তুললাম, খানা দুয়েক তুললাম কিন্তু এক্সপোজারটা তেমন যেমন ভালো হল না বলে মনে হচ্ছে।

২য় ফটোগ্রাফার। কেন, ঠিক হল না?

১ ম ফটোগ্রাফার। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আর শালী খালি নড়বে, খালি নড়বে, পোজিশন নিতেই দিলে না।

২য় ফটোগ্রাফার। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। (ভিখিরিদের দিকে একটু এগিয়ে যায়) আর রয়, অনর্থক 'মব'-এর ছবি তুলে খামখা ফিলম নষ্ট করে কী হবে! তুমি বরং মডেল দেখে দেখে তোলো, আমি ঠিক করে দিচ্চি, কেমন! হ্যাঁ, তাই করো, দ্যাটস্ রাইট। (কচি ছেলে কোলে জনৈক ভিখারিনীর প্রতি) ওহে, তোমরা সব খাবার পেয়েছ, খাবার! মানে গিয়ে এই খিচুড়ি! খিচুড়ি পাওনি সব তোমরা!

ভিখারিনী। না তো!

২য় ফটোগ্রাফার। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) সে কী!

(ভিখারিনী মুখখানা করুণ করে ফটোগ্রাফারের দিকে হাত পেতে ধরে।)

১ম ফটোগ্রাফার। (ক্যামেরা ডাক করতে করতে) মুখার্জি!

২য় ফটোগ্রাফার। য়্যাঁ।

১ম ফটোগ্রাফার। একটুখানি হাসি ফোটাতে পারো, হাসি জাস্ট এ বিট অব স্মাইল্। দ্যাখো না ভাই চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। হাসি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি 'বাংলার ম্যাডোনা'।

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, কাগজের সারকুলেশন তা হলে তো কাল দ্বিগুণ হে। ওঃ, 'বস' যা খুশি হবে তোমার ওপর মাইরি।

১ম ফটোগ্রাফার। খুব চমৎকার আইডিয়া, না?

২য় ফটোগ্রাফার। তবে, মাথা কার আবার দেখতে হবে তো!—কিন্তু হাসি এ আমি ফোটাই কী করে বলো তো?

১ম ফটোগ্রাফার। দ্যাখো না দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, জাস্ট এ বিট অব স্মাইল, দু-চারটে পয়সা-টয়সা চায় তো দাও না।

[ক্যামেরা তাক করতে থাক, ২য় ফটোগ্রাফার ভিখারিনীর দিকে এগিয়ে যায়।]

ভিখারিনী। আমার জন্যে নয় বাবু, এই কচি ছেলেটা! দয়া করো বাবা।

২য় ফটোগ্রাফার। (দরদভরে) পয়সা নেবে, পয়সা! এই নাও।

[পয়সা দেয়। পয়সা পেয়ে ভিখারিণীর মুখটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে।]

২য় ফটোগ্রাফার। রয়!

১ম ফটোগ্রাফার। ও. কে!

২য় ফটোগ্রাফার। কী রকম, সাক্‌সেস্‌ফুল তো?

১ম ফটোগ্রাফার। মোস্ট লাইক্‌লি, দেখা যাক। (একটু এগিয়ে গিয়ে) তুমি যাও বাছা এইবার, যাও। যাও। পয়সা-টয়সা পেয়েছ তো। আচ্ছা যাও।

[ভিখারিনী সরে যায়।]

(করুণভাবে) রিয়েলি!—আচ্ছা মুখার্জি, দ্যাখো তো ভাই, এই ধরনের আর গোটা দুচ্চার মডেল—(হঠাৎ প্রধানকে দেখে) ইয়েস্‌ দ্যাট্‌ ওল্ড ম্যান, দাঁড় করাতে পারো ভাই ওকে একবার বলে কয়ে—দ্যাখোনা একটু চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কে, কাকে মীন করছ তুমি!

১ম ফটোগ্রাফার। আরো ঐ যে, বুড়ো লোকটা, জামা না কী সেলাই করছে বসে বসে!

২য় ফটোগ্রাফার। ও, দ্যাট্‌ গ্রেট্‌ প্যাট্‌রিয়ার্ক!

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, বেড়ে নামকরণটি করেছ তো হে। গ্রেট প্যাট্‌রিয়ার্কই বটে। ফাইন নামকরণ হয়েছে। চল না দু একটা কথাবর্তা কয়ে দেখি বুড়োর সঙ্গে। (এগিয়ে গিয়ে প্রধানকে) হ্যাঁ হে, বলি বাড়ি কোথায় তোমার, বাড়ি!

প্রধান। জ্ঞেঁ-এ-এ বাড়ি! বাড়ি জ্ঞেঁ-এ-এ চিনতে পারবেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পারব না!

প্রধান। তা হলে বলি। বাড়ি আপনার গিয়ে হুই-ই আমিনপুর।

[হে হে করে হেসে]

১ম ফটোগ্রাফার। আমিনপুর?

প্রধান। আঁজ্ঞে।

১ম ফটোগ্রাফার। তা এখানে এসে তোমাদের সব থাকবার খাবার বেশ সুবিধে হয়েছে তো!

প্রধান। সুবিধে! আমাদের বাবু সুবিধে আর অসুবিধে!

১ম ফটোগ্রাফার। কেন? আচ্ছা দ্যাখো বাপু, এই তুমি একটুখানি উঠে দাঁড়াতে পারো?

প্রধান। উঠে দাঁড়াব বলছেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটুখানি, মানে একটা ছবি তুলব কি না?

প্রধান। ছবি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ ছবি, যেমন—

প্রধান। ছবি কিসের বাবু?

১ম ফটোগ্রাফার। (মুখার্জির প্রতি) ডীল উইথ্‌ হিম।

২য় ফটোগ্রাফার। (প্রধানের প্রতি) কেন তোমার! কেমন সুন্দর খবরের কাগজে বেরুবে। খবরের কাগজের লোক কিনা আমরা!

প্রধান। কাগজে বেরুবে। কাগজে বেরুবে। তা কী হবে তাতে করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কী আবার হবে, লোকে দেখবে, জানবে দেশের অবস্থা!

প্রধান। দেশের অবস্থা! তা পাবে কোথায় তারা কাগজ!

২য় ফটোগ্রাফার। কেন কিনে পড়বে।

প্রধান। কিনে পড়বে?

২য় ফটোগ্রাফার হ্যাঁ।

প্রধান। আপনারা বিক্রি করবেন!

২য় ফটোগ্রাফার। বিক্রি—হ্যাঁ তা বিক্রি না করলে পাবে কোত্থেকে লোকে কাগজ!

প্রধান। ও, তাও তো বটে। তা ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার। কঙ্কালের ছবির ব্যবসা। তা ভালো, কিন্তু আমারে কী করতে হবে এখন?

১ম ফটোগ্রাফার। তোমাকে, এই একটুখানি উঠে দাঁড়াবে আর কী। একটুখানি উঠে—

প্রধান। এমনি উঠে দাঁড়াব!

২য় ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, অমনি একটু দাঁড়াবে আর কী। পয়সা দেবখ'ন তোমায়। পয়সা দেবখ'ন।

প্রধান। পয়সা দেবে। তা দিয়ো। আমারে তোমরা পয়সা দিয়ো। তা এই মাটির হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে করে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটা! বেশ দেখতে হবেখ'ন। বেশ ভালো দেখতে হবে'খন।

২য় ফটোগ্রাফার। হাতে নেবে—হাঁড়িটা—(প্রথম ফটোগ্রাফারের ইঙ্গিতে) তা নাও, নাও।

প্রধান। (উঠতে উঠতে) হ্যাঁ তাই নেই, তাই নেই। হাতে করে দাঁড়াই হাঁড়িটা। হাতে করে দাঁড়াই—তো ন্যাও, তোলো এইবার, ছবি তোলো। কঙ্কালের ছবি তোলো—

২য় ফটোগ্রাফার। রয়! রয়! গেট রেডি।

প্রধান। তোলো, কঙ্কালের ছবি তোলো।

১ম ফটোগ্রাফার। (ছবি তুলে হাসতে হাসতে) ব্যস, এ তো কতক্ষণ আর!

প্রধান। হয়ে গেছে!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ দাদা, হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের তো ব্যাপার। এই নাও, তোমায় পয়সা দেব বলেছিলাম, এই নাও।

প্রধান। হ্যাঁ, পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও।

১ম ফটোগ্রাফার। (পয়সা দিয়ে) কেমন, খুশি তো! আচ্ছা!—দি গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক।

[পয়সা দিয়ে ফটোগ্রাফারের প্রস্থান।]

প্রধান। যাও বেচোগে, কঙ্কালের ছবি বেচোগে। যাও যাও।

(আবার সেলাই করতে বসে।
নেপথ্যে ঢ্যাঁড়া পেটার শব্দ—কী একটা যেন ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।
একটু পরেই ঢোল শহরৎ করতে করতে জনৈক ডোমের প্রবেশ।)

ডোম। (ঢোলে তিনটি ঘা মেরে) আরে বাজারখোলামে খিচড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও।

[ডুম, ডুম, ডুম—ঢোলে আবার তিনটি ঘা মারে।]

জনৈক ভিখারি। (কৌতুহলী হয়ে) কোথায় বাবা, কোথায় খিচুড়ি দেবে!

ডোম। বাজারখোলা বাজারখোলা। (ঢোলে তিন ঘা মেরে) বাজারখোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও। (তিন ঘা)

[ঘোষণা শুনে ভিখারিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। নিজের নিজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলেই বাজারখোলার উদ্দেশ্য রওনা হয় তাড়তাড়ি।]

রাধিকা। (চিৎকার করে ডাকে) ও বিনো, বিনো রে। (কুঞ্জকে) ওগো বিনো কোথায় গেল গো! য়্যাঁ, ও বিনো—দ্যাখো গে সে হয়ত আগে ভাগে গিয়েই বসে আছে, যত সব— ওমা, তা বলে তো যাবে, কী কাণ্ড—

[দু-একজন ভিখিরি ও প্রধান ছাড়া কুঞ্জ রাধিকা প্রভৃতির দ্রুত প্রস্থান। প্রধান কাঁধের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, জামা আর বিশ্বের আবর্জনা চাপিয়ে মুখ নিয়ে ডোমের কথার অনুকরণ করতে থাকে।]

প্রধান। বাজারখোলা খিচুড়ি দেওয়া হবে, সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্। সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্, ডুম্।

[অন্য ভিখারিদের পিছুপিছু প্রধানের প্রস্থান। জনৈক টাউটের প্রবেশ। লিকলিকে চেহারা। জুলজুলে দৃষ্টি। ঢুকেই পার্কের বেঞ্চের এককোণে বসে বিড়ি টানতে টানতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।]

বিনো। ওমা, এরা সব গেল কোথায় গো!

[টাউট মুচকি মুচকি হাসে।]

কী করি এখন। ওগা বাবু, বলতে পারো এরা সব গেল কোথায়? আমি বাবু একটু ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি—এখন কোন দিকে যাই আমি—

টাউট। বলা-তো মুশকিল এখন কোন্ দিকে গেছে ওরা! তা—

বিনো। হায় হায় হায় হায়, কী করি এখন আমি!

টাউট। সঙ্গো কে ছিল তোমার!

বিনো। কী বললেন বাবু?

টাউট। না বলছি বলি সঙ্গো আপনার জন তোমার কারা ছিল?

[বিনোদিনী নিরুত্তর।]

স্বামী আছে তোমার?

বিনো। ছিল, ফেলে চলে গেছে।

টাউট। ফেলে চলে গেল। এই সোনার পারা মুখ তোমার বাছা, ফেলে চলে গেল এমন একলাটি। ভারি অন্যায় কথা। এখন এই শহর-বাজার, মন্দলোকের অভাব নেই—মুশকিলের কথা।

বিনো। (করুণভাবে) কী করি এখন বাবু আমি?

টাউট। মেয়েমানুষ তুমি বাছা, কিই বা করতে বলব তোমায়—

বিনো। আপনি বাবু এট্টু সন্ধান করি দিন, বাপ আমার।

টাউট। সন্ধান আমি এখন কোথায় করি বলো তো চট করে। কত লোকই তো এসেছে শহরে! আর তাদের মুখ চিনলেও বা কথা ছিল। সন্ধান করলেই কি আর সন্ধান মিলবে! সে অসম্ভব— আচ্ছা দ্যাখো বাছা, আমি তোমার জন্যে যেটুকু করতে পারি বলি। দ্যাখো, এখানে আমার জানা-শোনা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। বলে কয়ে আমি হয়তো সেখানে তোমার খাবার থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। এই আর কি টুকিটাকি কাজকর্ম করলে সংসারের, আর দুটি দুটি খেলে, বাড়ির বাবু খুব লোক ভালো, একেবারে শিবতুল্য— এখন কথা কী, যে আপাতত সেখানেই না হয় ক'দিন থাকলে, তারপর এদিকে আমিও খোঁজ পত্তর করে দেখলাম.....কী বল?

বিনো। আপনি আমার মা-বাপ বাবু।

[টাউট উঠে দাঁড়ায়।]

টাউট। খাবার থাকবার সেখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, তবে বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একুট আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে.....তো নাও, এসো এসো। তোমার ভাগ্যি ভালো বুঝলে, যে, হে হে কী আর বলি, এসো এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বজলি বাতির আলো চঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে— আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই

গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তুপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ডাস্টবিনের আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে ক্ষুধ্ব কুকুরের গোঙানি স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। প্রধানকে খানিকটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফটক থেকে খানিকটা দুরে দাঁড়িয়ে বড়োবাড়ির দিকে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাচ্ছে সে দুটি ভাতের জন্য। একটু পরে রাধিকাকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুখে তারও দুটি অন্নের কাতর প্রার্থনা। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটার একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও চেঁচিয়ে ওঠে পাশব আক্রোশে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে—ক্ষত বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। (খণ্ডদৃশ্য দুটি দেখাবার জন্য স্পটলাইটের সাহায্য নেওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়)।

বড়োকর্তা। (জনৈক ভদ্রবেশী আগন্তুককে একটা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা করে) এই যে আসুন, আসুন (মুখে হাসি) হেঃ হেঃ আসুন।

[প্রতিনমস্কার জানিয়ে ১নম্বর ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন সরাসরি। গল্প করতে দুই ও তিন নম্বর ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

২য় ভদ্রলোক। আসল কথা কী জান ভাই, টাকা, টাকা। টাকায় সব করে। আমাদের বাঙালি বিজনেসম্যানদের টাকা কোথায়! যাও বম্বে, আমেদাবাদ, দেখবে—

[বড়োকর্তাকে দেখে একগাল হেসে]

আরে, লেট করে ফেল্‌লাম নাকি?

বড়োকর্তা। (হেসে) আরে এসো এসো, ভায়া এসো, ভায়া এসো। তারপর মুখুজ্জ্যে কোথায়? নির্মলবাবু এলেন না?

২য় ভদ্রলোক। (হাত তুলে) আসছে, আসছে সবাই আসছে। (পেছনে তাকিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আরে, কৈ হে, আবার পেছনে পড়লে ক্যানো! বলি, হ্যাঁ হে মুখুজ্জে।

২য় ভদ্রলোক। তারপর, বড়োবাবু যে একেবারে দেখি—উঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। নির্মলবাবুর প্রবেশ।]

নির্মলবাবু। (এগিয়ে এসে) এই যে দাদা।

২য় ভদ্রলোক। আরে এসো এসো। নির্মলবাবু এসো।

৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর.....

বড়োকর্তা। আর বোলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তারপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষাবিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা। হ্যাঁ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে (হাসি) আর কী করেই বা কম করি বল? এই তো ফ্রেন্ডস্ এণ্ড রিলেশন্ যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়। তারপর—

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি।]

২য় ভদ্রলোক। তা তো বটেই। তা আর হবে না। এ আর একটা বেশি কথা কী হল। এই তো তোমার গিয়ে গত এপ্রেলে, আমার নাতির অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ে-সাদির মতন সে তো আর তেমন একটা বিরাট কায্যি নয়, তবু ছেঁটে কেটে শ আষ্টেকের কম কিছুতেই করতে পারলাম না। আর এ তো তোমার গিয়ে রীতিমত একটা বিয়ের ব্যাপার।

নির্মলবাবু। তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁ! হাজার খানেক লোক খাচ্ছে, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

১য় ভদ্রলোক। তবে!

নির্মলবাবু। তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাল্লে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি।

বড়োকর্তা। অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক। তার আর কী করবে কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাক মার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা এই ধরো না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মন চিনি তাঁর চা-ই নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেডলক, কমপ্লিট ডেডলক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি। ওপ্‌ন মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল, পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাদের আছে তারা বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার নেই কি-না?

২য় ভদ্রলোক। দ্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারব না বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন

সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বন্ধ করে দিতে হয়।

নির্মলবাবু। তা দিতে হয় দেবে। তা বলে—যেটা অন্যায় তাকে প্রশয় দিতে হবে?

২য় ভদ্রলোক। দেব! ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ করে দেব! (সহাস্যে) খুব রসিকতা করতে পারো যা হোক তুমি নির্মলবাবু।

[বড়োকর্তা, তৃতীয়ভদ্রলোক সবাই হো হো করে হাসেন।]

বড়োকর্তা। চলো যাই চলো; ভেতরে চলো।

[ভদ্রলোকদের প্রস্থান।]

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে।

কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে।

দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান। (অন্ধকারের ভেতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা.....

রাধিকা। (সভয়ে) ওমা—একেবারে কামড়ে খেলে গো।

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে ছুটে যায় ডাস্টবিনের কাছ থেকে।]

(কুকুরের প্রতি) ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দুর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু থু—

[আক্রোশে থুথু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়।]

ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো। ইস্—স্—স্।

[ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে।]

প্রধান। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটাকে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা—

[প্রস্থান]

রাধিকা। (কুঞ্জের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে) খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ। না।

কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সব কিছু স্মরণ করে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে ; তারপর বাঁ হাতখানা দেয় রাধিকার মাথার ওপর।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

(হারু দত্তের বাড়ি। দুপুরবেলা সামনের-বারান্দায় জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। খানিকটা দুরে বারান্দার এক কোণে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন পেছন ফিরে বসে আছে। আর একজন, নাম খুকীর মা—বাল্য বিধবা, হারু দত্তের মুখোমুখি বসে বেশ সপ্রগলভ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছে। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।)

হারু দত্ত। (হুঁকোয় বিলম্বিত টান মেরে) গাঁয়ের জন্যে আমি কী করেছি আর না করেছি তা জানে রাজ্যের লোক আর (ওপর তাকিয়ে) ভগবান। বেশি কী বলব। নিজের প্রশংসা নিজে করার তো অভ্যাস নেই কোনোদিন!

খুকীর না। সে আর আপনি কী বলবেন বাবা। আমরা তো জানি। (প্রৌঢ় ব্যক্তিকে) এই তো তোমার গিয়ে সেবার খুকীর অসুখের সময়। কবেকার কথা বলছি, এই গত কার্তিক মাসের কথা। ঐ যে , যে-বার ঝাড়ের দশটা বাঁশ বিক্রি করে ফেললাম তোমারে দিয়ে হরোর বাপ্!

চন্দর। (চিন্তিত মুখে) দশটা না আটটা!

খুকীর মা। দশটা। না, সে এখনও আবার সঠিক মনে রয়েছে! দশটা বাঁশ আমি তোমারে বেচলাম। তিন টাকা দু আনা দাম হয়, তা তুমি তখন আমারে দিলে তিন টাকা, আর খুচরো ছিল না বলে দু আনা আর দিলে না। তারপর সেই দুআনা আবার কাটান্ গেল তোমার গিয়ে পাঁচ পালি ধানে।—মনে পড়ছে?

চন্দর। (ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হইছিল বটে, ঠিক ঠিক।

হারু দত্ত। (হুঁকো থেকে মুখ তুলে) মোক্তার হলে পারতিস তুই খুকী মা জজ-কোর্টের।

খুকীর মা। (হেসে) তা আজকালকার মেয়েরা তো বাবা আপনিই বলেনযে, লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের সঙ্গো সব পাল্লা দিয়ে আপিস্ কাছারি করছে! তা সে রকম শিক্ষে দীত্রে পেলে বাবাঠাকুর আপনার আর্শীবাদে আমি জজকোর্টের উকিল মোক্তারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসতাম।

হারু দত্ত। (খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে) তা তুই পারতিস খুকীর মা, তুই যা মেয়ে (স্নেহভরে দূর থেকে চড় তুলে) তোকে একেবারে.....বড্ড দুষ্টু তুই!

খুকীর মা। তা সে যাগ গে, যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ সেই খুকীর অসুখের সময়। পনেরো দিনের দিন মেয়ের তো ঐ অবস্থা! কী করি! গেলাম ছুটে রমানাথ ডাক্তারের কাছে। কত করে বললাম, বলি—চলুন একটুখানি, মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসুন ডাক্তারবাবু, ব্যাজ্ঞাতা করি, পায়ে পড়ি! নাঃ, বললে টাকা ফেল তারপর! কী ধম্মডাকাতে লোক গো! কত করে বল্লাম, আজ দিতে পারছি নে টাকা বাবা, দুদিন পরে নেবেন। কিছুতেই না। তারপর কোথায় যাই কী করি, মনে পড়ল বাবাঠাকুর-এর কথা, ছুটে গেলাম। সামনা সামনি বলছি বলে তোমরা হয়তো ভাববে যে বড়ো বাড়িয়ে বলছে মাগী, কিন্তু বাবাঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে আমি বলছি—যে এর ভেতরে একরত্তি মিথ্যে নাই।—সে জানেন আমার অন্তর্যামী। (চোখ বোজে) তা সে কী বলব, আমার মুখ দেখেই বাবাঠাকুর জানতে পারলেন। কিছু বলতে হল না। গেলেন; ওষুধ দিলেন, তিন দিনের দিন মরা মেয়ে আমার ঝাড়া দিয়ে উঠল। এমন কী খুকী যে দিন অন্নপত্যি করবে সে দিন নিজে বাড়ি বয়ে এনে চাল পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বল্লেন খুকীর মা, সে রকম পুরোনো চাল তো তোর ঘরে নেই—রাখ এই কটা, খুকীরে দিস। তাও কম করে তোমার সের দুয়েকের কম নয়। —এই রকম দায়ে পড়ে যখনই গিয়েছি, না-বাক্যি কখনও শুনিনি বাবাঠাকুরের মুখে। আর শুধু কি তোমার আমার বেলায়, যে এয়েছে, যে এয়েছে—। তা সে আপনি কী করেছেন আর না করেছেন তা জানি আমরা, আপনি কী বলবেন।

হারু দত্ত। (হুকো থেকে মুখ তুলে) কিছু না, কিছু না। আমি দেখব তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন!—কী বল চন্দর?

চন্দর। না, তা, সে তো যথার্থই। এর আর কথা কী!

হারু দত্ত। এই যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সব, এ কেন। কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে! দু-চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো! না হলে এতে করে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁ! গাঁটের পয়সা খরচ করে, এরে ধরে, তারে ধরে কেন কী দরকার আমার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার দরকার কী! অবিশ্যি হ্যাঁ বলতে পার যে না করলেই পার তুমি—

চন্দর। না—তাই আর একটা কথা হল!

হারু দত্ত। না—এই কথার কথা বলছি। বলি মানুষ তো আর সকলেই তোমার আমার মতো না, মন্দলোকও তো আছে সংসারে, না কী! বলতে পারে—মানুষের মুখ চন্দর তুমি এখন ঠেকাবে কী দিয়ে? আজ্ঞে না, বলে, আস্তে আস্তে ন্যাজ নাড়ে, ঐ বাঘেই তো মানুষ মারে, হুঁ হুঁ—বলতে পারে যে, না করলেই পার তুমি এই পরোপকার। বলে কে তোমারে করতে! কী উত্তর দেবে তুমি এ কথার! অথচ দ্যাখো বোঝে না যে, সব মানুষগুলোই

যদি তাদের মতো হত তো কবে উচ্ছন্নে চলে যেত এই সমাজ সংসার, ধ্বংস হয়ে যেত সব।

চন্দর। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে হারু দত্তর চোখে চোখ রেখে) ধ্বংস হয়ে যেত সব!

হারু দত্ত। তা যেত না? (খুকীর মায়ের দিকে তাকায়)

খুকীর মা। হুঁ হুঁ। (হাসে আর মাথা নাড়ে)

হারু দত্ত। তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। (জোর দিয়ে) তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। অনেক চন্দর, এখনও অনেক জানবার বোঝাবার আছে এই জগতে—তো ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।

চন্দর । আবার টিপ সই দিতে হবে?

হারু দত্ত। ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মত এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল! তো নাও এসো এসো। আমার আবার ওদিকে—ওরে কই রে।

[চন্দর উঠে এসে হারু দত্তের সামনের কাগজে একটি টিপ সই দেয়।]

চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঃ। যাগগে, ও ঠিক হয়েছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। (টিপ-সইটা কাগজ তুলে দেখে) এই তো, দিলে—ফুরিয়ে গেল!

চন্দর। (আবেগ ভরে) বাবা, দেখো আমার মেয়েটা য্যানো—

[কণ্ঠরোধ হয়ে আসে চন্দরের।]

হারু দত্ত। কিচ্ছু বলতে হবে না, কিচ্ছু বলতে হবে না। সে দায়িত্ব যখন নিইছি আমি—

চন্দর। না, তাই বলছি বাবা, তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে, তারপর থেকে বলতে গেলে এক রকম নিজে হাতে করেই—(চোখ মোছে) তা আর আমার গর্বের কিছু থাকল না। (কেঁদে ফেলে)

হারু দত্ত। (কৃত্রিম অভিমানের সুরে জোরে) ফের্ আবার তুই মেয়ের জন্যে দুঃখ করছিস! মেয়ে তোর, মেয়ে আমার না!

খুকীর মা। (চন্দরের প্রতি) দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।

হারু দত্ত। য়্যাঁ—আরে কইরে!

[নেপথ্যে 'যাই বাবু'।]

দুত্তুরি তোর নিকুচি করেছে যাই বাবুর! বলি ঘাটে নৌকা এয়েছে?

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সপ্রতিভভাবে) তুলে ফেলব বাবু জিনিসপত্তর সব নৌকায়।

হারু দত্ত। তুলে ফেলব—এতক্ষণ কী করছিলি? গিয়েছিস তো সেই কবে।

ভৃত্য। নৌকা আনতে গিছলাম বাবু ঘাটে।

হারু দত্ত। ওঃ গিছলে তো একেবারে উদ্ধার করেছ আমাদের। ব্যাটা হারামজাদা কোথাকার! নৌকা আনতে কতক্ষণ লাগে! ক'দিনের পথ এখান থেকে? আবার মুখে মুখে তক্ক করছে দাঁড়িয়ে! চোখ নামা, চোখ নামা, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার চোখ নামা!—দিনে দিনে পৌঁছুতে না পারি তো দেখিস'খন তখন।

ভৃত্য। তা ভাটা পড়েছে টেনে যাব'খন।

হারু দত্ত। যাবে তো আর এখানে দাঁড়িয়ে রুপে দেখাচ্ছ কাকে, যাও!

[ভৃত্য প্রস্থানোদ্যত]

আর শোন, তিন দাঁড় করতে বলবি।

ভৃত্য। ভাটা পড়ছে, দু দাঁড়েই মেরে দেব'খন.....

হারু দত্ত। না, আর মেরে দিতে হবে না। তিন দাঁড় করতে বল-গে, এ হে-হে-হে। ভৃত্যের প্রস্থান।

[হুঁকোটি হাতে নিয়ে মেয়েদের প্রতি]

তো এগোও, এগোও তোমরা সব আস্তে আস্তে। নে যা খুকীর মা এদের সব।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

তা হলে চন্দর, তোমার হল গিয়ে—(ট্যাঁকে কাপড়ের পুঁটলি থেকে নোট বার করে গুনে দেয়) নাও ধর—

[দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা চন্দর কুণ্ঠিত হাতে টাকা নেয়]

এখন এই নাও; তারপর ঘুরে আসি আমি—যা দিয়ে যা হয়—(তামাক টানে)

চন্দর । মেয়ে বিক্রি করলাম আমি! মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী—

[চন্দরের প্রস্থান।]

(হারু দত্ত তিন মাথা এক করে জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে টর টর শব্দে তামাক টানে আর চন্দরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।)

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে; আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটার মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে

যেন আক্রোশে ফুঁসছে কার ওপর। নিদারুণ একটা প্রতিহিংসা চক্ চক্ করছে নিরঞ্জনের চোখে মুখে।

বিনোদিনীর পরনে মোটামুটি একখানা আধময়লা শাড়ি। নিরঞ্জনের গায়ে ছোট ঝুলের একটা ছিটের হাফ শার্ট, পরনে ন-হাতি একখানা আধময়লা ধুতি। খালি পা, অসংস্কৃত হাবভাবের দরুণ পরিবেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না যেন কাউকেই।

বিনোদিনী। (হঠাৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে) শুধু কি এই! সে নির্যাতনের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না।

নিরঞ্জন। (হাতের তালুতে ঘুষি চেপে) এর প্রতিশোধ আমি—(অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে) আচ্ছাঃ।

বিনোদিনী। (ভাঙা গলায়) মাখন মরণাপন্ন, দিদির অসুখ, মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা—

নিরঞ্জন। (স্বগত) দাদা!

বিনোদিনী। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা, কোথায় একটু ওষুধ, কোথায় একটু পত্যি,— আর তোমার জ্যেঠা, তার কথা তো বলবারই না— দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কেবল শ্রীপতি-ভূপতির কথা। ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকার, চারদিকে সাপখোপের ভয়, মড়কের দেবতা বাতাসের কাঁধে ভর করে কেঁদে বেড়াচ্ছে আগানে বাগানে সাঁই সোঁ—ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস করে না মানুষ—কে কার কথা শোনে, বুড়ো অমনি চল্ল বন-বাদাড় ভেঙে, বলে এট্টু খোঁজ করে আসি আমি শ্রীপতি-ভূপতির। সে দেখাও যায় না, সওয়াও যায় না। আর এই অবস্থার ওপর দত্তর সে কী অত্যাচার! জীবনে আমি কোনোদিন সে-সব কথা ভুলব না!

নিরঞ্জন। গাঁয়ে কী কেউ মানুষ ছিল না যে তার প্রতিবাদ করে!

বিনোদিনী। ছিল, কিন্তু দত্তর ওপর কথা বলে কে? জীবন না তার চলে যাবে অপঘাতে।

নিরঞ্জন। (আক্রোশে) অপঘাতে! তো দেখি আজ কোথায় গিয়ে পড়ে সেই অপঘাত, দেখি (পায়চারি করে)

[রাজীবের প্রবেশ]

রাজীব। (নিরঞ্জনকে লক্ষ করে) আরে পাঁয়তারা ভাঁজিস নাকি রে রাখ—(হঠাৎ বিনোদিনীকে দেখে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) এইডা কী! রাখহরি! (বিনোদিনীকে) তুমি এইহানো আইছ ক্যান! বলি এইহানো তোমার কী প্রয়োজনটা, য়্যাঁ। আচ্ছা বলতো দেখি বাবু দ্যাখলে কী কইতো। যাও ভিতর যাও। যাও কইত্যাছি আমি তোমারে ভিতরে যাও। যাও।

[নতমুখে বিনোদিনীর প্রস্থান।]

রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ চুপ কইর‍্যা আছস্ অহন, কথা যে কস্ না বড়!

নিরঞ্জন। কী সুট সুট করে ঘরে ঢুকে!

রাজীব। কী তা জানস্ ভালো তুই, আমারে জিগাস করে আহাম্মক। কইত্যাছিলা কি তুই ওয়ারে! ভাবস্ বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না.....বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না!

নিরঞ্জন। চেঁচাবেন না আপনি শুকনের মতো। আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

রাজীব। (দুটো কাঁধ একটু তুলে) কী, কী কইলি! শকুন, আমি চেঁচাই শকুনের মতো, নাকি! খারা তোর ত্যারা ত্যারা কথা আমি ছুটাইয়া দিত্যাছি; খারা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিচ্ছিস তাইতো! বাবু তোরে আজ করে কী দেহিসনে.....বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!

[বেগে কালীধনের প্রবেশ]

কালীধন। সরকার মশাই যাবেন না দাঁড়ান আপনি। (নিরঞ্জনকে) দাঁড়াও তুমি। (রাজীবের প্রতি) জ্ঞানদার কাছ থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। ব্যাপার কী আমায় খুলে বলুন সরকার মশাই। বলুন, গোপন করবার দরকার নেই আমার কাছে বলুন!

রাজীব। (মাথা চুলকে) কবা বা কী! কী রে রাখহরি, কথা যে কস্ না অহন, জবাব দে!

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি জানো এটা সেবাশ্রম!

রাজীব। আমি তো তোমারে বরাবরই কইয়্যা আসত্যাছি কালীধন যে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি কখনই প্রশ্রয় দিবা না। তা তো শুনবা না; তা তোমার শোননের জো নাই। আরে এগুলা কি মানুষ!

[নিরঞ্জন রাজীবের প্রতি কটাক্ষ করে।]

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে। তোমার মত কর্মচারী আমার কোনো দরকার নেই। (প্রচণ্ড ধমকের সুরে) বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান। বেগে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব। (বাধা দিয়ে) আরে এইডা কী কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দর মহলে। বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভিতরে যাও।—কী আশ্চর্য!

বিনোদিনী। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।—যেতে দাও আমাকে।

কালীধন। জ্ঞানদা!

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

(ইঙ্গিত করে) ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।

জ্ঞানদা। (বিনোদিনীর হাত ধরে) চ, আহা ও রকম করতে নেই চ, আ—য়!

[বিনোদিনীর হাত ধরে জ্ঞানদার প্রস্থান। রাজীব গমনোদ্যত]

কালীধন। সরকার মশাই! আপনি ওর পাওনা-গণ্ডা যা হয় মিটিয়ে দিন এক্ষুনি যেমন করে হোক। ওকে আর এখানে রাখা চলবে না—ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তো—

রাজীব। আরে আমিও তো তাই কই। বলে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি প্রশ্রয় দিবা না। কিন্তু তা তো শুনবা না, তোমার যত কারবার হইল এই সব ছুটলোকগুলার সঙ্গে। আরে এগুলো কি মানুষ!

কালীধন। আচ্ছা সে আপনাকে দেখতে হবে না, যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে, যান।

রাজীব। আরে যাইতেছি, আমার লাইগ্যা কি? আমি তো যাইয়াই আছি, হ-অ-অ—

[প্রস্থান।]

কালীধন। হ্যাঁ, তাই যান এখন।.....আচ্ছা কারবার যা হোক। ধীরে সুস্থে যে একটু গুছিয়ে বসব আর কাকেই বা কী বলি; হয়েছেই যত সব।

[একটা বড়ো কুশান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।]

এই কে আছিস্!

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সেলাম করে) বাবু।

কালীধন। আচ্ছা কী করিস তোরা সব ওখানে বসে বসে বলত, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

ভৃত্য। আজ্ঞে সঙ্গে সঙ্গেই তো এসে পড়েছি!

কালীধন। সঙ্গে সঙ্গেই?

ভৃত্য। আজ্ঞে—

কালীধন। চুপ চুপ। বিকেলবেলা কে ছিল, গেটে?

ভৃত্য। বিকেলবেলা, আজ্ঞে আমিই ছিলাম।

কালীধন। রাখহরি এখানে এসেছিল কখন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে তিনি তো এয়েছেন সেই দিনমানে।

কালীধন। দিনমানে!

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। হুঁ, কিন্তু আর কখনও যেন ওকে সেবাশ্রমে ঢুকতে দেওয়া না হয়!

ভৃত্য। ঢুকতে দেব না!

কালীধন। না, তবে আর বলছি কী, ঢুকতে দিবি নি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কালীধন। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে নি।

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীধন। হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন।

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। আর রামরতনবাবু এলেই আমাকে একবার—

[নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ ; বাইরে তাকিয়ে ভৃত্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।]

কী দেখছিস ও দিকে!

ভৃত্য। আজ্ঞে ঘোড়ার গাড়ি করে কারা যেন এলেন মনে হচ্ছে।

কালীধন। ঘোড়ার গাড়ি করে!

ভৃত্য। (একটু লক্ষ করে) আজ্ঞে ঠিক চিনতে পাচ্ছি নে। তবে তিন চারদিন আগে এই দুপুরবেলার দিকে কোট পরা একজন বাবু মতো লোক এইছিলেন, দেখতে অনেকটা তাঁরই মতো— সঙ্গে আবার দু'জন (ভালো করে তাক করে) হ্যাঁ দুজনাই তো, মেয়ে-নোকও রয়েছে দুজনা।

কালীধন। মেয়ে লোকও আছেন! (উঠতে উঠতে) ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়ে লোক! কে আবার এল চল্ চল্ তো দেখি।

[ভৃত্যসহ কালীধনের প্রস্থান ত্রস্তে নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। (চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কারা?

নিরঞ্জন। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। দত্ত। সেই হারু দত্ত।

বিনোদিনী। হারু দত্ত!

নিরঞ্জন। (শব্দ করে) স্-স্-স্! এই বাবু ওর মহাজন কি না! তাই মাঝে মাঝে আসে এখানে। কিন্তু মেয়ে দুটো—

[বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকায়।]

বিনোদিনী। কারা ওরা?

নিরঞ্জন। ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে, তবে দুরে থেকে মুখের আদলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে দত্তর সঙ্গো যখন এয়েছে তখন ও আমাদের গাঁয়ের মেয়ে না হয়ে যায় না। উঃ শালা—যাক ঠিক আছে এইবার সব কটাকে এক সঙ্গো পেঁচিয়ে —দাঁড়াও।

বিনোদিনী। (অপ্রস্তুত ভাবে) কী করবে কী?

নিরঞ্জন। কিছু না, তুই চুবো। শোন, একেবারে ভেতরে চলে যাবি, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, বুঝলি? কারো সঙ্গো কোনো কথা কি অন্য কিছু বলবার দরকার নেই। একেবারে চুপ। আমি চল্লাম।—

[গমনোদ্যত]

বিনোদিনী। আচ্ছা.....কিন্তু তুমি চললে কোথায় তুমি?

নিরঞ্জন। সে বলব'খন পরে, কিন্তু ঐ যা বললাম, যা পালা শিগগির—

[নিরঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

জ্ঞানদা। ওমা আমার কী হবে গো! তুই এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন লা। যা ভেতরে যা, ভেতরে যা। ভদ্দরলোকেরা আসবে এখন, যা ভেতরে যা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান।]

(বাইরে তাকিয়ে বড়ো বড়ে চোখ করে) আবার কে এল গা, কারা? (একটু দেখে ঠাওর করতে না পেরে) যাগ্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ কী আমার, য়্যাঃ।

[হাত-ধরাধরি করে হারু দত্ত ও কালীধনের প্রবেশের সঙ্গো সঙ্গো ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায়ে জ্ঞানদার প্রস্থান।]

কালীধন। (হাসতে হাসতে) তাই আমি ভাবি, যে সেই যে গেল দত্ত—এ দত্তর চিঠি নেই পত্তর নেই। ওরে তামাক দে রে।

হারু দত্ত। (হেসে) আরে ভাই সে ঝামেলার কথা আর বল কেন! এই দেব দিচ্ছি করতে করতেই সকাল থেকে রাত এগারটা অবধি নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পেইছি কোনোদিন! ওদিকে মহাজনের তাগিদ, কন্ট্রাক্টরের চাহিদা, তারপর আবার তোমার গিয়ে এই—(হেসে) একেবারে ব্যতিব্যস্ত সদা সর্বদা।

কালীধন। মহাপুরষ তুমি হারু দত্ত। এতগুলো তাল তুমি সামলাও কী করে এক হাতে। চাড্ডিখানি কথা নয়।

হারু দত্ত। সামলাতে হয় ভাই ; সামলাতে হয়। না সামলে উপায় কী বলো! খেটে যখন খেতে হবেই তখন.....

কালীধন। (সহাস্যে) উ—ঃ—ঃ বড্ড জোর বলেছ হে য়্যাঁ, আরে তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায়!

হারু দত্ত। (কালীধনের উরুতে ঠেলা মেরে) যাঃ, কী যে বল মাইরি.....

কালীধন। তা বেশ তো হল, এইবার শহরে একখানা বাড়ি-টাড়ি, বল তো দেখি—সস্তায়-মস্তায় করে দি। লোক আছে আমার হাতে।

[আন্তরিকতার আধিক্য হেতু হারু দত্তের গলার ঘামাচি মেরে কালীধন দত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল।]

হারু দত্ত। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কী, শহরে বসবাস! না বাবা, ও আমার ধাতে সইবে না। আরে ভাই আমরা হচ্ছি তোমার যাকে বলে গিয়ে জাত গেঁয়ো লোক, ও শহরে চালচলন বরদাস্ত হবে না আমাদের ধাতে।

[ভৃত্য তামাক দিয়ে গেল।]

কালীধন। (হারু দত্তর গায়ে ঠেলা মেরে) গেঁয়ো চালচনটা কী রকম! (খ্যাক খ্যাক্ করে হাসি) গেঁয়ো চালটা শহরে চালের চেয়ে কী কম বাবা—(আরও হাসি) উ-রি বাবারি বাবারি; আশ্চর্য করে দিলে তুমি আমায়—

[সহসা মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।]

[দারোগা ও জনকয়েক কনস্টেবল সহ নিরঞ্জন এবং কতিপয় ভদ্রব্যক্রির প্রবেশ।]

দারোগা। আপনার নাম কালীধন ধাড়া?

কালীধন। (দারোগার দিকে তাকিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

[হারু দত্তের দিকে তাকায়।]

দারোগা। আশ্চর্য হলে নাকি!

কালীধন, হারু দত্ত অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হারু দত্তর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে শঙ্কায়।

কালীধন। তা আপনারা এখানে...

দারোগা। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছেন না, (হারু দত্তকে) আপনার নাম কী?

হারু দত্ত। এই সেরেছে, (দারোগার দিকে ঘুরে অপ্রতিভভাবে) আমার নাম বলছেন?

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম আপনার—

হারু দত্ত। আমার নাম হারানচন্দ্র দত্ত।

১ম ভদ্রলোক। হারানচন্দ্র দত্ত! কেষ্ট ঠাকুরের শত নাম।

দারোগা। পুরানচন্দ্র দত্ত হারু দত্ত, কেমন?

হারু দত্ত। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। হুঁ, (কালীধন ও হারু দত্তর প্রতি) মেয়েদের কোথায় রেখেছেন?

কালীধন। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) মেয়েদের? কী বলছেন স্যার! এটা সেবাশ্রম।

দারোগা। হ্যাঁ, তা সেবাশ্রমে মেয়ে থাকবে না?—বিশেষ উদ্যোগী যখন আপনারা, য়্যাঁঃ! বলুন বলুন চট্ করে বলুন, নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে বলে দিচ্ছি। বলুন।

১ম ভদ্রলোক। ধান চালের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে সবার সাত রকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছে দেখছি। সাংঘাতিক খুনে তো।

দারোগা। বলুন! (রাখহরির প্রতি) কই, যাও তো তুমি কনস্টেবলদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বার করে নিয়ে এসো সব মেয়েদের।

নিরঞ্জন। এসো তোমরা সব আমার সঙ্গে।

[কনস্টেবলগণ ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

ভদ্রলোক। উঃ, একেবারে চারদিক থেকে লক্ষ্মীলাভের ব্যবস্থা আর কী। ধানচালের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে সবার... এই লোকটাই তো সেদিন মশাই আমাকে চাল দেয়নি। অথচ গুদামজাত করে রেখেছে যে কত হাজার মণ চাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু চান, দেখবেন অমনি হাত উলটে বলবে—নেই। ঠগ কোথাকার!

[দারোগা সব নোট করে নেয়।]

কালীধন। বলুন, বলে নিন। আমাদের কথার যখন কোনো মূল্যই নেই তখন—

ভদ্রলোক। মূল্য নেই, মূল্য রেখেছ? খুনে কোথাকার! (দারোগার প্রতি) দেখুন না মশাই, মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন সাধু পুরুষ সব, যত অন্যায় অত্যাচার করছি আমরা ওদের ওপর। উঃ, সার্থক জোচ্চোর তোমরা বাবা। ভিটেয় ঘুঘু চরাতে তোমরাই পারো।

দারোগা। (ভদ্রালোকের প্রতি) আঃ!

[নিরঞ্জন, চন্দরের দুই মেয়ে, বিনোদিনী, জ্ঞানদা, রাজীব, কনস্টেবলদ্বয় ও ভৃত্যের প্রবেশ। এই সমস্ত লট!]

নিরঞ্জন। না, (চন্দরের দুই মেয়েকে দেখিয়ে) এই এঁরা দুজন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে।

হারু দত্ত। চুরি করে আনেনি দত্ত।

দারোগা। আপনি চুপ করুন। (নিরঞ্জনকে) হ্যাঁ তারপর বল।

নিরঞ্জন। (বিনোদিনীকে দেখিয়ে) আর উনি হচ্ছেন আমার ইস্ত্রী। পেটের দায়ে শহরে এসে উঠলে পরে ঐ বাবুর লোকদের চোখে পড়ে এখানে এসে ওঠে।—আমি এখানে ঐ বাবুর দোকানেই একজন গোমস্তা—তাই হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যেতেই আমি বল্লাম বলি তুমি এখানে তা বললে—

দারোগা। যাক সে উপন্যাস পরে শোনা যাবে। আপাতত তুমি বলছ যে উনি তোমার স্ত্রী কেমন?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকথা। (বিনোদিনীকে) কী গো বল না!

[বিনোদিনী নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।]

দারোগা। (হেসে) যাকগে, তারপর, তুমি এই বাবুর গোমস্তার কাজ করতে?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, চালের গুদোমে কাজ করতাম।

দারোগা। গুদোমে মানে দোকানে।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ তা, মানে আমি গুদোমেই কাজ করতাম কিনা।

দারোগা। গুদোমে, তা কী পরিমাণ চাল আছে এখনও সেখানে?

[হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা যায় কালীধনের চোখে-মুখে]

নিরঞ্জন। তা সে বিস্তর মণ।

ভদ্রলোক। বিস্তর মণ মানে আন্দাজ কত মণ।

নিরঞ্জন। তা সে আপনার গিয়ে সওয়া লাঘ মণটাক হবে।

দারোগা। স-ও-য়া লা-খ মণ!

নিরঞ্জন। (থতমত খেয়ে) মানে আমি এট্টা আন্দাজে বললাম কম বেশিও হতে পারে।

দারোগা। দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট। (রাজীবকে লক্ষ্য করে, নিরঞ্জনকে) উনি কে?

নিরঞ্জন। উনি ঐ বাবুর ডান হাত, সরকার মশাই।

ভদ্রলোক। (শ্লেষভরে) উনি নাকি আবার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সব ট্যাঁকে রাখেন বলেন।

দারোগা। আচ্ছা!

রাজীব। এই আমি ঐ কথা কই নাই।

দারোগা। চুপ করুন আপনি। (কনস্টেবলগণকে) এই তিনোকো হাতকড়ি লাগাও।

(কনস্টেবলগণ কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।
হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে
এমন ভঙ্গি করল যেন হাতকড়ি ছাড়িয়ে আসতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না।)

৮৬.১০ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক)

যুদ্ধ বন্যা মহামারী আর এরই কোলে স্বচ্ছন্দ বর্ধিত, কালনাগ রূপ হারু দত্তের অত্যাচারে অতঃপর প্রধান সমাদ্দার হয় ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গোটা পরিবারটা অসহায়তার সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠে শহরের এক পার্কে। অসংখ্য ভিখিরিদের ভিড়ে আত্মসম্মান বোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল সকলে একসঙ্গে মিলে। সেখানেও অশমি সম্পাত ঘটে গেল। এই অশনি সম্পাতে গোটা পরিবারটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল দুটি টুকরোয়। বাজার খোলায় খিচুড়ি দেওয়া হবে, অন্যান্য ভিখিরিদের সঙ্গে সেই দিকে যায় কুঞ্জ, রাধিকা। আর ঘটনার অভিঘাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যবিহীন সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়স্ক প্রধান সমাদ্দারও অন্যান্য ভিখিরিদের পিছু পিছু সেও কোথায় যায়। ক্ষুধার আতিসহ্য দুর করবার আত্যন্তিক আগ্রহে তারা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে বিনোদিনীর কথা। বিনোদিনীকে তাই পিছনে ফেলে চলে গেল তারা। 'এমন সময় হন্দদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।' কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধানকে না দেখে অবাক হ'ল। 'ওমা এরা সব গেল কোথায় গো।'

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অতঃপর বিনোদিনী গিয়ে পড়ল টাউটের পাল্লায়। সে অসহায় বিনোদিনীকে খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে নিয়ে এসে তুলে দিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে।

কালীধন ধাড়া একজন চালের চোরাকারবারী। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের অবদান। অল্প পয়সায় চাল কিনে গুদামজাত করে সে বেশি পয়সায় বিক্রি করে গুপ্তপথে। তার গুদোমে চালের যোগান দেয় দালাল হারু দত্ত। সেও টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে ধান চাল সংগ্রহ করে সবিশেষ কম দামে, অভাবের সুযোগে লোককে ঠকায় আবার সুযোগমত জমি ধরে টান মারে। নিজের জন্যে মোটা মুনাফা রেখে কালীধনের গুদামে তুলে দেয় বস্তা বস্তা চাল। কালীধন তার ওপর লাভের মোটা অঙ্ক চাপিয়ে দাম বাঁধে আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় চাল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কেবলমাত্র সস্তা হয়ে যায় মানুষের জীবন। গরীব দুঃস্থ বাবার অবিবাহিত মেয়ে বা অভাবগ্রস্ত স্বামীর অল্পবয়সী বৌ অতি সস্তায় চলে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। হারু দত্ত চালের চোরাকারবারের সঙ্গে এ কারবারটাও করে গুছিয়ে। সেও চালের সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নিয়ে কালীধনের সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে।

কালীধনের এই সেবাশ্রমে হারু দত্তছাড়া মেয়ে সরবরাহ করবার জন্য অনেক দালালচক্র শহরের অলিগলিতে, পথে পার্কে ঘোরাফেরা করে। এমনি এক দালাল সমাদ্দার পরিবার থেকে বিশ্লিষ্ট বিনোদিনীকে পার্ক থেকে তুলে এলে কালীধনের সেবাশ্রমে বিক্রি করে দিয়ে যায়! এখানে বিনোদিনী অতর্কিতভাবে মিলিত হয় তার স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন প্রধান সমাদ্দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সমাদ্দার পরিবারে বিপর্যয়ের পূর্বে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে চলে এসে কাজ নিয়েছিল কালীধন

ধাড়ার চালের গুদামে। হঠাৎ একদিন চালের গুদাম থেকে এসে উঠেছিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে। এখানেই সে মিলিত হয় বিনোদিনীর সঙ্গে।

বিনোদিনীর কাছে সেবাশ্রমের অবৈধ এবং ন্যক্কারজনক বিবরণ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়। ফন্দি আঁটে বিনোদিনীর সঙ্গে। থানাতে গিয়ে সেবাশ্রমের সমস্ত নোংরা বিবরণ, কালীধনের গুদোমে গুদামজাত চালের পরিমাণ এবং কালো বাজারে সেই চাল বেশি দামে বিক্রির বিবরণ পেশ করে। সেই সঙ্গে চাল ও মেয়ে সরবরাহকারী হারু দত্তের নামও উল্লেখ করে। ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তিটিও থানায় এসে পড়ে, যে কালীধনের চালের দোকানে চাল কিনতে গিয়ে কালীধনের চাহিদামত অর্থ দিতে পারেনি বলে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল।

সমস্ত বিবরণ শুনে দারোগা সাক্ষীসহ নিরঞ্জনকে নিয়ে অতর্কিতে কালীধনের গুদামে হানা দেয়। সেইদিনই হারু দত্ত দুটি কিশোরীকে তার অভাবী বাবার কাছ থেকে অল্প টাকায় কিনে এনে তুলেছিল কালীধনের সেবাশ্রমে। দারোগা বামালসমেত কালীধন এবং হারু দত্তকে ধরে ফেলে। হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন বিনোদিনী তারপরে চলে আসে তাদের গ্রামে, আমিনপুরে। বন্যা এবং দুর্যোগ তখন কেটে গেছে। গ্রামে ফিরে তারা তাদের ভাঙা ঘরখানা জুড়ে তেয়ে "আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে।" গ্রামে থাকা বা ফিরে আসা চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে মাঠে চাষ করে। ফসল কেটে ঝেড়ে ধান গোলায় তোলে।

অপরদিকে, প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা পার্ক থেকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকের বাড়ি উচ্ছিষ্ট ও ফ্যান ভিক্ষে করতে করতে এসে পড়ে এক বড়লোকের বিরাট বাড়ির সামনে। সেদিন সে বাড়িতে বিবাহের বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমুঠো ভাতের জন্য অনেক চিৎকার করে। কাতর প্রার্থনা জানায় একটু খাবারের জন্য। প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাতে থাকে, 'আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু! বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা... ' কিন্তু বিবাহের উৎসবে মত্ত মানুষদের কানে সে কাতর প্রার্থনা পৌঁছয় না।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

বাড়ির বড়ো কর্তা এবং তার বড়লোক বন্ধুরা তখন পারস্পরিক বৈভব আর প্রাচুর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। ভিখিরিদের প্রতি একটু করুণা বিতরণের সহৃদয় অন্তঃকরণটা চোরাপথে উপার্জিত তাদের ঐশ্বর্যের চাপে বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। এখান থেকে একরাশ নৈরাশ্য আর হতাশা বুকে নিয়ে পেটভর্তি ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে কুঞ্জ আর রাধিকা এসে ওঠে এক লঙ্গারখানায়। এখানে আসবার আগে প্রধান মানসিক চাপে, অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে দলছুট হয়ে গিয়েছিল।

৮৬.১১ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নিখরচার লঙ্গারখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো—ফ্রি-কিচেন। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবভঙ্গিতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্যে থেকে জনৈক ভিখারিনীর তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অঝানা শঙ্কায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁকা হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃদ্ধ ভিখারী তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখে।)

১ম ভিখারিনী। (নেপথ্যের চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে এলে) দ্যাখো দিনি কাণ্ড হুঁঃ (আশেপাশের পাঁচ জনের প্রতি) আচ্ছা, নিবি তো সব একসঙ্গে করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য্যাঁ. সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কী রকম ধারা বে আক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!

১ম ভিখারি। (উৎকর্ণ হয়ে) তা চেঁচাচ্ছে কেন, ওরকম করে?

১ম ভিখারিনী। ওমা, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তা চেঁচাবে না। কী বলে!... ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে সব ইনজিশন দিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি।

জনৈক বৃদ্ধ ভিখারি। (কাশতে কাশতে) ও সব ধরে নিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। এইবার যে যেখানে পারো পালাও! পালিয়ে যাও সব। নইলে যে ভাবছ নঙ্গারখানার ভিতরি আছ বলে তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, হে হে হে হে (হেসে) সে ভেবো না মনে। ও সব ধরে নিয়ে যাবে। পালিয়ে যাও এইবার। সময় থাকতে চলে যাও! সময় থাকতে চলে যাও সব।

কুঞ্জ। যাচ্ছে নিয়ে কোথায় সব নরি ভরতি করে!

২য় ভিখারি। কী জানি! কেউ বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বলছে সমথ চাষী লোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

১ম ভিখারিনী। ইনজিশন্ দিয়ে আবার মেরেও ফেলছে অনেক।

কুঞ্জ। দূর ও মিথ্যে কথা।

২য় ভিখারি। না তা বলা যায় না, হতে পারে।

কুঞ্জ। পাগল, না মাথা খারাপ। আরে যে ইনজিশনে মানুষ মরে, প্রাণঘাতী হলেও তো

তার নিজস্ব এট্টা দাম আছে। আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবননের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ো গেল, য্যাঃ।

২য় ভিখারি। তো নরি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সব ধরে-ধরে?

৩য় ভিখারি। শুনি তো অনেক কথাই। কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার শুনছি—

কুঞ্জ। তার চাইতে ও নিজের থেকে হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো, একেবারে পায়দলে। কাজ কী গিয়ে মিছে অত হাঙ্গামায়।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, ও নরিতে করে আবার কেডা কোন্‌দিকে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই!

কুঞ্জ। (হাত তুলে) হ্যাঁ এই বাগে একেবারে সিধে গিয়ে ওঠ উত্তরে, নেই কোনো ঝামেলা।

২য় ভিখারি। কোন্ দিকে বললে?

কুঞ্জ। (হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে) কেন সোজা এই উত্তরে।

২য় ভিখারি। তোমাদের উত্তরে? আমাদের দক্ষিণে। পাঁচ মহল্লার নাম শুনছ!

কুঞ্জ। পাঁচ মহল্লা।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, তা দূর আছে এখান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারি। সেই কথাই তো ভাবি, যে নড়ে বসতে পারিনে, অথচ এতটা পথ এ আমি কেমন করে পাড়ি দেব? কী গতি হবে আমার? (কাশতে কাশতে) না শেষ পর্যন্ত রেখে যেতে হবে হাড় কখানা এখানেই—(আর্তকণ্ঠে) তোমরা সব চলে যাও। আমারে ছেড়ে চলে যাও, ভূলে যাও আমারে। ভোল আমারে—

[নেপথ্যে ঘন্টাধ্বনি।]

২য় ভিখারি। হোই আবার ঘন্টা দেছে, আবার ঘন্টা দেছে।

১ম ভিখারিনী। বেজেছে এতক্ষণে—বাব্বা, ঘন্টা দিতে একেবারে বেলা হেলিয়ে দেছে আজ। চ, চ। [কুঞ্জ, রাধিকা ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য সকলের মেটে হাঁড়িকুড়ি সহ ত্বরিতপদে প্রস্থান।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে) আমার সময় হবে না, তোমরা সব চলে যাও। (একটু সুরে) গাঁয়ে ফিরে যাও।

কুঞ্জ। (রাধিকার প্রতি) গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ— (রাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে) দেখিছিস—!

রাধিকা। (চিন্তান্বিতা মুখে) সত্যিই তো।

কুঞ্জ। (করুণ হেসে) হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।

রাধিকা। চল না, আমার কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব? (কেঁদে ফেলে) সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—(কাঁদে)

কুঞ্জ। ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে। চল চল, বউ আমরা ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির শহরে আর থাকব না।

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) মিথ্যে বসে আঁকড়ে থাকা, তোমরা সব চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও।

কুঞ্জ। বউ!

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে জলভরা চোখে তাকায়।]

রাধিকা। কী।

কুঞ্জ। ওঠ, চল।

রাধিকা চল।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) দুরুস্তরের পথে আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিকিৎসাকেন্দ্র। দরদালানের মতো লম্বা একখানা ঘরের দু-পাশ দিয়ে সারবন্দী ভাবে সব খাটিয়া পাতা রয়েছে। সবগুলি বেডেই রোগী ভরতি। ঘরের মাঝখানটায় একজন নার্স একখানা চেয়ারে বসে আছে মাথায় হাত রেখে, কনুই দুটো তার সামনের টেবিলটা ছুঁয়ে আছে। টেবিলটার ওপর ওষুধপত্রের বোতল, চিকিৎসার সরঞ্জাম, খাতা-পত্র ঠাসা। দুজন রোগী শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত শব্দ করে আর্তনাদ করছে। নার্সটি থেকে থেকে রোগীদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে।

হল-ঘরের সামনে ডানদিক স্বতন্ত্র একটু স্বল্প-পরিসর বারান্দা। বারান্দার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল; দুখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ। দেওয়ালে কাঠের র‍্যাকে কোট ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। একজন যুবক ডাক্তারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে 'আউটডোরের' রোগীদের নিয়ে। বারান্দা থেকে নিচে

নেমে যাবার সিঁড়ির ওপর নিঃস্ব রোগীরা ভিড় করে বসে আছে। একজন কম্পাউণ্ডারকে ওষুধের টেবিলের কাছে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক রোগীরা সব বসে আছেন ডাক্তারের টেবিলের সামনের দিকে বেঞ্চের ওপর—হাতে সব শিশি। চিকিৎসাপ্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে রয়েছে মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজ করা দশ বারো বছরের একটা ছেলে।

পায়ে পট্টি জড়ানো, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে কোট পরা জনৈক জমাদার গোছের লোক খবরদারি করছে জনতাকে।

হল-ঘরের পেছন দিককার বেড়ের এক নম্বর রোগীর কাতর আর্তকণ্ঠ শুনে নার্স উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল, তুলিতে করে কী একটা ওষুধ নিয়ে। একটু পরেই আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে একখানা খাতায় কী যেন লিখছে, এমন সময় রোগীরা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। নার্স। (রোগীদের দিকে মুখ করে ধমকের সুরে) কী হচ্ছে, কী!

ধমক খেয়ে আঁই-আঁও শব্দ করতে করতে এক নম্বর রোগী চুপ করে যেতে নার্স অন্য রোগীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ি দেখতে থাকে। হল-ঘরের ভেতরে ক্ষণকালের জন্য নেমে আসে কবরের প্রশান্তি। একেবারে চুপচাপ, একটু পরেই আবার অন্যদিক থেকে দু-নম্বর রোগী ওঁ ওঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে চুপ করে গেল। নার্স একনজর তাকিয়ে নাড়ি দেখে চলে—সব রোগীদের এক এক করে। এই গেল হল-ঘরের ভিতরের অবস্থা। আর বাইরের বারান্দায় সাহেবি পোশাক পরা যুবক ডাক্তারটি রোগীদের বুকে এক এক করে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে চোখ টেনে পিট বুকে আঙুল ঠুকে "নিঃশ্বাস নাও" "নিঃশ্বাস নাও" বলে পরীক্ষা করে চলে আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেস্‌ক্রিপশন হাতে করে রোগীরা আবার কিউ-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওষুধ নেবে বলে। ধুতি সার শার্ট পরা কম্পাউণ্ডারটিকে ওষুধের টেবিলের কাছে ভীষণ ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। পেট মোটা লাল, নীল সাদা ওষুধের বড়ো বড়ো বোতল থেকে তাকে হরদম ওষুধ ঢেলে দিতে দেখা যাচ্ছে রোগীদের শিশিতে।

কম্পাউণ্ডার। (একজনকে ওষুধের শিশি এগিয়ে দিয়ে অন্য একজন রোগীকে) তোমার!

ডাক্তার। (জনৈক দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করে) কাশতে লাগে, বুকে?

আট নম্বর রোগী। হ্যাঁ বাবু, বড্ড যন্তন্না!

ডাক্তার। যন্তন্না হয়! কী রকম যন্তন্না?

আট নম্বর রোগী। কী রকম যন্তন্না। যন্তনা—(প্রকাশ করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে)

ডাক্তার। জিভ্ দেখি, জিভ্!

[রোগী জিভ দেখাল।]

বড়ো করে বড়ো করে—

উঁ! (প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতে) রাত্রে ঘুম হয়?

[রোগী ঘাড় নেড়ে 'না' বলে।]

হয় না!

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে না।

ডাক্তার। (প্রেস্‌ক্রিপশনটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিয়ে) আচ্ছা ঐ ওষুধটাই আরো হপ্তাখানেক চলুক, বুঝলে?

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে আজ যে ওষুধটা পাল্‌টে দেবেন বলেছিলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। পাল্‌টে দেব বলেছিলাম নাকি! আচ্ছা, এ হপ্তাটা ঐ চলুক তো!

আট নম্বর রোগী। কিন্তু জ্বর যে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না!

ডাক্তার। হবে হবে, খেয়ে যাও ওষুধ। একটা কিছু হবার সময় যত তাড়াতাড়ি হয়, সারবার সময় কি আর তত তাড়াতাড়ি সারে? অস্থির হলে চলবে কী করে। (অন্য রোগীর প্রতি) হ্যাঁ তারপর—। (আট নম্বর রোগীর প্রতি) আচ্ছা যাও তুমি তা হলে।

আট নম্বর রোগী। জ্বরটা যে ডাক্তারবাবু কিছুতেই—। এট্টুখানি ভালো ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।

ডাক্তার। আরে বাবা ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব? যা ভালো, ঐ তো দিইছি যা দেবার।

আট নম্বর রোগী। এ ওষুধ তো এক মাস ধরেই খাচ্ছি; জ্বর তো কিছুতেই যায় না। আর এই পা ফোলাও তেমনি আছে।

ডাক্তার। ও জ্বর-টর সব ওতেই যাবে।

আট নম্বর রোগী। যাবে?

ডাক্তার। হ্যাঁ যাবে, যাও—আমার এখনও অনেক রোগী দেখতে হবে।

আট নম্বর রোগী। তবে যাই, তাই যাই।

[কিউ-এ গিয়ে দাঁড়ায়।]

ভদ্রলোক রোগী। (ডাক্তারের টেবিলের সামনে যিনি বসেছিলেন) সবই ম্যারেলিয়া কেস্‌, না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। মোস্ট্‌লি তবে—এই দেখুন না, নট ওনলি ম্যালেরিয়া, শোথ হয়েছে লোকটার। প্রায় মাসাধিক কাল ভুগছে। এদিকে ওষুধ নেই, পত্তর নেই, বলুন তো কী দিয়ে কী চিকিৎসা করি।

ভদ্রলোক রোগী। তা জানান না কেন এ সব কথা ওপরে।

ডাক্তার। লিখে লিখে হয়রান মশাই, বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পারো তো দরকার কী এই 'শ্যাম শো'-ব, বন্ধ করে দাও হাসপাতাল। হা, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি। ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্থা করতে দু-ঘন্টার জায়গায় নয় দশ

ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু'শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুন!

ভদ্রলোক রোগী। তা তো বটেই।

ডাক্তার। আন্তরিকতা থাকতেও সে আন্তরিকতার কোনো মূল্য নেই। ট্রাজিডিই তো আমাদের এই। যাগ্‌গে সে সব কথা—(অন্য রোগীর প্রতি) কই দেখি তোমার কী?

[হঠাৎ হল-ঘরের ভেতর থেকে একটা রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায় আঁ-া-া
নার্স একবার ত্রস্ত পায়ে রোগীর দিকে এগিয়ে যায়।
তারপর রোগীকে একনজর দেখেই ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে।]

নার্স। (ত্রস্তে) ডাঃ মুখার্জি

ডাক্তার। য়্যাঁ।

নার্স। পাঁচ নম্বর পেশেন্টের, 'হেমপ্‌টিসিস' হচ্ছে।

ডাক্তার। হেমপ্‌টিসিস্‌! কারণ?

নার্স। কারণ, আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। চলুন, চলুন।

[ডাক্তার ও নার্সের হল-ঘরে প্রস্থান।
ওদিকে চলমান 'কিউ' সরে সরে যাচ্ছে।
যে যার মতো ওষুধ-পত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছে।]

(কয়েক মুহূর্ত রোগীর দিকে তাকিয়ে) চার্টটা দেখি।

[নার্স চার্ট এনে দেয়।]

(চার্ট দেখে) উঁ, টেম্পারেচারটা তো দেখছি বেশ 'রাইজ' করেছে আবার। সেই পাউডারটা দেয়া হয়েছিল?

নার্স। হ্যাঁ।

ডাক্তার। একটু বরফ আনতে বল জমাদারকে, চট করে।

[ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করে!]

নার্স। (বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে) জমাদার!—জমাদার!

[জমাদারের প্রবেশ।]

থোড়াসে বরফ লাও।

জমাদার। লাতা হুঁ।

ডাক্তার। নেই একটা ওষুধ, নেই একটা কিছু; ধেত—

নার্স। (এগিয়ে এসে) ইনজেক্‌শন্‌ দেবেন নাকি একটা, গ্লুকোস!

ডাক্তার। গ্লুকোস ইনজেশন নেই।—নেই ইনজেকশন, নেই ওষুধ , আছে শুধু ঘর ভরতি রোগী—নন্‌সেন্স কারবার।

[হঠাৎ পাঁচ নম্বর রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়।
নার্স ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে ঘরে রোগীর দিকে।]

নার্স। ডাক্তার মুখার্জি, পেশেন্ট—

ডাক্তার। আই য্যাম হেল্পলেস্। কিচ্ছু করবার নেই।

নার্স। (নাড়ি দেখে) কিন্তু পেশেন্ট যে সিঙ্ক্ করছে ডক্টর—

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) ও হো, আই নো রেবা হি উইল ডাই। হি, এণ্ড দি হোল লট অব দেম। দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্ অ্যাণ্ড বাংলার্স।
ডাক্তারের চিৎকার শুনে সমস্ত রোগী বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে উঠে বসে আতঙ্কে

[আ আ আঁই শব্দ করতে থাকে।
কম্পাউণ্ডার একবার উঁকি মেরে দেখে যায়।]

(নিজেকে সামলে নিয়ে) শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তোমরা সব। কিছু হয়নি তোমরা শোও, শুয়ে পড়ো। শোও, হ্যাঁ শোও।

[রোগীরা সব পূর্বের মতো আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।
আর নার্স মৃত পাঁচ নম্বর রোগীর খাটিয়া ঘিরে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে দিল।
আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
রোগীদের কিউ পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে।
বাইরের ওষুধের টেবিলের কাছে শুধু কম্পাউণ্ডারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।
স্টেচারসহ দুজন ধাঙ্গারের প্রবেশ।]

নার্স। (বাহকদ্বয়ের প্রতি) পাঁচ নম্বর।

জনৈক বাহক। জি।

[মৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাহকদ্বয়ের প্রস্থান।]

ডাক্তার। (নিজ টেবিলে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ নার্সের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসে) কী দেখে আশা করেছিলে যে লোকটা বাঁচবে, রেবা!

নার্স। আশা? না আশা আর কী!

[ডাক্তার কাজে মনোনিবেশ করে। প্রধানের প্রবেশ।]

(হঠাৎ নার্স দেখতে পায় যে দরজার কাছে আলু থালু বেশে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা পাগলের মতো। বগলে নোংরা কতকগুলো কাগজ-পত্তর,

হাতে একটা হাঁড়ি। আর কাঁধে কতকগুলো নোংরা শতছিন্ন জামা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল।) —কী, তোমার আবার কী?

ডাক্তার। (মুখ তুলে) কে!

নার্স। কী চাই তোমার?

প্রধান। আমার, আমার এট্টু ওষুধের দরকার মাঠান।

নার্স। ওষুধ।

[কাঁচুমাচু মুখ করে প্রধান মাথা নাড়ে।]

কিসের ওষুধ?

ডাক্তার। কী বলছে কী! কে দেখি!

নার্স। দেখুন তো!

ডাক্তার। (উঠে) কি হয়েছে কী! কী বলছ তুমি।

প্রধান। (এগিয়ে এসে) আমার এট্টু ওষুধ বাবা, (পায়ের দিকে লক্ষ করে) বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। বড্ড ব্যথা! কোথায়, দেখি! (হাতের আবর্জনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে) ওগুলো কী?

প্রধান। এই, আছে।

ডাক্তার। এমনিই আছে?

প্রধান। (অপ্রতিভ হেসে) হ্যাঁ—এমনিই আছে।

ডাক্তার। ফেলে দাও না ওগুলো! কী হবে ও দিয়ে!

প্রধান। এগুলো ফেলে দিলে আর কী থাকবে! ওগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়। এ সব হল—

ডাক্তার। অমূল্য রতন। ফেলে দেওয়া যায় না, না?

প্রধান। না (হাসে)

ডাক্তার। (নার্সকে) বুঝতে পেরেছেন, অসুখ!

নার্স। (মুখ টিপে হেসে) একটু একটু।

ডাক্তার। এ রকম যে কত হয়েছে—হবেই কিনা!

প্রধান। (না বুঝে) নিশ্চয় হবে, কেন হবে না (হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে) উ-হু-হু-হু, বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। কোথায়, দেখি ব্যথা কোথায়!

প্রধান। (হাত তুলে) এই এখানে। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইখানে ব্যথা।

ডাক্তার। (পা টিপে) কই ব্যথা কই! লাগে টিপলে?

প্রধান। না।

ডাক্তার। তবে, ব্যথা কোথায়?

প্রধান। (মৃদু হেসে) ঐতো, ঐখানেই ছিল।

ডাক্তার। ঐখানেই ছিল, আরে।

প্রধান। হ্যাঁ ঐখানেই ছিল। তারপর পালিয়ে গেল। এক দৌড়ে পালিয়ে গেল—

[নার্স মুখ টিপে হাসে।]

ডাক্তার। পালিয়ে গেল দৌড়ে?

[প্রধান হাত তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।]

কোথায় গেল?

প্রধান। (বলিষ্ঠ আকার ইঙ্গিতে) ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—

(হঠাৎ শরীরের কোনো অংশে ব্যথা লেগে চাপা গলায় আ-া-া শব্দ করে বুকে হাত চেপে আধবসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার নার্সের দিকে তাকায় আর প্রধান দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে থাকে।)

ডাক্তার। (ক্ষীণ হেসে) আবার ব্যথা করছে তো?

প্রধান। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ, আবার ব্যথা করছে। এ ভয়ানক ব্যথা দারুণ যন্ত্রণা। এ ব্যথা এই আছে, এই নেই। কালবোশেখির মেঘের মতো আছে এ ব্যথা একেবারে হু হু করে উঠে আসে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে—তারপর এই যে মাতন লাগে আরে ব্বাস রে বাপ্ সে একেবারে ঘর বাড়ি ভেঙে্ চুরে—

ডাক্তার। (ধমকের সুরে) থামো।

প্রধান। (সবিনয়ে) থামতে বলছেন!

ডাক্তার। হ্যাঁ থামতে বলছি—ও ব্যথা ট্যথা তোমার সব বাজে কথা, মিথ্যে।

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) মিথ্যে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মিথ্যে। একদম মিথ্যে।—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। তোমার ব্যথা নেই।

প্রধান। (বোকার মতো) ব্যথা নেই?

ডাক্তার। না ব্যথা নেই, কিছু নেই! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।

প্রধান। (হঠাৎ নোংরা জামা-কাপড় আর আবর্জনাগুলো জোরে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে

দাঁড়ায়) তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।

[নিজের আবেগে কথা বলতে বলতে প্রধানের প্রস্থান।
ডাক্তার ও নার্স বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে প্রধানের দিকে।]

(পটক্ষেপ)

৮৬.১২ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক)

কুঞ্জ আর রাধিকা এই লঙ্গরখানায় এসে জানতে পারে রাস্তার থেকে পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে। 'কেউ' বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। [২য় ভিখিরি] আর সোমত্থ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র, ...নিবি তো সব একসঙ্গো ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বেআক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে) মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এটা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!' [১ম ভিখারিনী] সব মিলিয়ে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাই কুঞ্জ বলে, 'আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবনের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ে গেল, য়্যাঁ।' [৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য] এখান থেকে তারা আবার এও জানতে পারে,—সমত্থ চাষীলোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' কেন না. 'কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওযা যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' [৩য় ভিখিরি]

কুঞ্জ আর রাধিকার সমস্ত অন্তরটা আমিনপুরের জন্য কেঁদে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। ত্বরিতে কুঞ্জ রাধিকাকে প্রস্তাব দেয়, 'চল বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।' [৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য] রাধিকা এই প্রস্তাবে রাজি হয়। চল না, আমার কি অসাধ । গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?—সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—' [ঐ]

বন্যা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের বুকে গভীর দুঃখ আর হতাশা। কিন্তু 'নবান্নে' শুধু দুঃখ আর হতাশার কাহিনী নেই। তা যদি থাকত তাহলে এই নাটক নাট্য আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারত না, পারত না গণনাটকের মর্যাদা অর্জন করতে। 'নবান্নে' দুঃখ জর্জরিত একদল মানুষের ক্রন্দন আছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের হতাশাচ্ছন্ন হাহাকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গো প্রচণ্ড আশাবাদের ইঙ্গিত, 'ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে!' 'নবান্ন' নাটকের মূল্য এখানেই। 'সব হবে' এই আশাবাদই 'নবান্ন' নাটকের আসল ঐশ্বর্য। দুঃখের অমানিশা কাটবে প্রভাতের অরুণালোয় জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই আশা ও আলো কুঞ্জর চোখে ঝলমল করে ওঠে। 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' [ঐ] এ হল প্রথম দৃশ্যের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। দরদালানের মত একটি লম্বা ঘরের দু'পাশের সারবন্দী খাটিয়ায় রোগী ভর্তি। তাদের কেউ কেউ তীব্র আর্তনাদ করছে। বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন। তিনি রোগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেছেন। কম্পাউণ্ডার লাল নীল বোতল থেকে ওষুধ রোগীদের শিশিতে ঢেলে দেন।

অপুষ্টিজনিত কারণে নানা ধরনের রোগ। চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত ওষুধ নেই—রুগীর অভিযোনও অন্তহীন। ডাক্তারবাবু নিষ্ঠাভরে রোগী দেখেও তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় অসহায় বোধ করেন। অনুভব করেন, "আন্তরিকতার কোন মূল্য নেই"। বলেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস্'।

এমনি সময় আকস্মিক দুর্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন অনাহারক্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার নোংরা জামা কাপড় ও স্তূপাকৃতি আবর্জনা নিয়ে ঢুকে পড়ে। সে যে ব্যথার কথা বলে তার সঙ্গে সেই কালবোশেখির যোগ দেখা যায়। সবমিলিয়ে অঙ্কটি যেন হাতাশা ও আশার দোলায় আন্দোলিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি।

৮৬.১৩ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শহর থেকে ফিরে ভাঙা ঘরখানা জুড়েতেড়ে নিরঞ্জন আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে। পর্দা সরে যেতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন গেরস্থ চাষীকে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনটার মাঝখানে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত দেখা যাচ্ছে। জনতার ভেতর তিনটে গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রুপের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের নিজস্ব একটা ঢং আছে। বাকি লোক সব উঠোনে বসে এ ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তবে বসে আছে যারা তাদের আলোচনাটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ঐ তিনটে গ্রুপ। তবে বৈশিষ্ট্য এখানেও যে যখন যে গ্রুপটা কথা বলছে কখনও কখনও বাকি দুটো গ্রুপের আলোচনায় ভাটা পড়ছে অভিনয়ের খাতিরে। মঞ্চের ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রুপ ফকির, সুজন ও ভজনের মধ্যে পর্দা সরে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। মঞ্চের মাঝখানে ও বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আর দুটো গ্রুপ তখন নিচু গলায়, আকারে ইঙ্গিতে আলোচনা চালাতে থাকে। দাওয়ার ওপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি বসে, আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।

ফকির। (সুজনের প্রতি) বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে জগতে জন্মেছি আবার মরবার সময় নিজের দেনাটা যথারীতি ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব, এই তো হয়ে আসছে দেখি চিরটাকাল., জন্ম-জন্মান্তর। তা এ আর এটা কথা কী এমন বিশেষ।

ভজন। না এ যা বলছ তা খাঁটি কথাই বলেছ।

সুজন। সেই কি আর এটাটা কথা হল।—চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।

ফকির। উপায় কী বল!

সুজন। উপায়—করে নিতে হবে উপায়।

ফকির। তা য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—এ তো আর তোমার আজকের সমস্যা না।

সুজন। য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—কী রকম যে তুমি কথা বল মামু তা বুঝে উঠতে পরিনে। আরে সমস্যা যদি মেনেই নিতে তো উপায় খুঁজে বের করবার দরকারটা পড়ে কিসে! সব্বার আগে ওটা যে এট্টা সমস্যা, এই বুঝটা তো অন্তত থাকা দরকার, না কী?

ফকির। না তা তো—

সুজন। তো তবে।

(সুজনের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান গ্রুপের আলোচনাটা নিস্তেজ হয়ে আসতেই মঞ্চের মাঝখানটায় দ্বিতীয় গ্রুপটা মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রুপের আলোচনাটা তখন বাহ্যত দু-একটা কথাবার্তা কানাঘুসো ও ভাবে-ভঙ্গিতেই ব্যক্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের রহিম বরকত ও গোলাম নবীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। বরকত তার কচি মেয়েটাকে সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এনেছে।)

রহিম। কিন্তু তা যেন না হয় দিলাম, কিন্তু পীরের দরগায় খাসি! সেটা তো দিতেই হয়।

বরকত। কেন!

রহিম। মানত রয়েছে যে।

বরকত। তোর দেখছি শতেক দেনা!

গোলাম নবী। মানত আছে পরে দিও খাসি। তাতে কোনো দোষ নেই। আসলে দেওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। দুদিন পেছিয়ে দিলে আর তুমি জাহান্নামে যাবে?

রহিম। কিন্তু মওলানা যে আমারে তা হলে একেবারে সেরে ফেলে দেবে'খন! এই বলে তাই—

বরকত। বললেই হল আর কী মওলানা। সুবিধে-অসুবিধে নেই মানুষের! ও তুমি দেবার হয় পরে দিও। ...খোদাতালার চোখ তোমার গে ঐ মওলানার কটা চোখের মত ছোটো না. একথা মনে করে রেখো।

বরকতের কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনায় ভাটা নামে। আরম্ভ হয় তখন তৃতীয় গ্রুপের কথা বার্তা। দিগম্বর, সখীচরণ প্রমুখ চারজন লোক আলোচনা আরম্ভ করে।

দিগম্বর। আরে পাওনাদার তো আমরা সকলেই। তার জন্যে আর কী, হ্যাঁঃ! জীবন-ভর খালি দেনাই করে গেলাম, পেলাম না আর কোনো কিছু কারো ঠেঙে।

সখীচরণ। ফসলডা যদি একবার মরে-পিটে তুলতে পারি তো দেখি একবার।

দিগম্বর। এখন বলেছ বটে! কিন্তু পেট ভরবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে যে আবার দয়াবান হয়ে উঠেছ। তখন তার শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না—এই রোগেই তো মরলে চাষী, —দিল করে রেখেছ সব রাজার নাগাল অথচ সঙ্গতি নেই এক আধলার।

সখীচরণ। না এবার আর—

[দাওয়ার উপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ-করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।]

বরকত। তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, কী বল মণ্ডল! এসে তো গেছে সকলেই একরকম।

দয়াল। হ্যাঁ আর দেরি কী?

নিরঞ্জন। না, আর দেরি কী, এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকত। হ্যাঁ শুরু করে দাও।

দিগম্বর। আর সকলেই তো একরকম উপস্থিত হয়ে গেছে, এইবার—

সখীচরণ। আরম্ভ কর।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। দয়ালদা শুরু কর।

[নিরঞ্জনের কানে কানে যেন কী কথা বলল।]

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। (মাথা নেড়ে হাসতে লাগল)

দয়াল। আমিই করব, তার চাইতে বরং—

নিরঞ্জন। না তুমিই কর, শুরু করে দাও তারপর—

বরকত। হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও তারপর সকলে মিলে সেডারে

দয়াল। (একটু হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা!

[সহসা একটা ঋজুতা ও কাঠিণ্যের ছাপ ফুটে উঠে দয়ালের মুখে।]

দয়াল। (মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে তার হঠাৎ মুখ তুলে তুলে) মানে কথা হচ্ছে যে, আমরা, যারা আজ এখানে উপস্থিত হইছি, তারা বেশ ভালো করেই সমস্যার কথা জানি। কী যে সমস্যা, না সে সমস্যা খুবই গুরুতর সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা—ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর আবার তোমার সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা। এখন প্রকৃত অবস্থা যা, তাতে করে সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যে আমরা আজ এখানে দশজন বসে ভেবে-চিন্তে এটা উপায় বের করব বলে স্থির করেছি, এই সময়ডাও পর্যন্ত আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়।

নিরঞ্জন। ঠিক, অতি ঠিক।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

দয়াল। আমি বলছিনে যে এ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন নেই। আছে, খুবই আছে। সে কথা না, তবে অবস্থার গুরুত্বডা যাতে করে আমাদের কারো কাছে এক মুহূর্তের জন্যেও কম মনে না হয়, সেই কারণেই ঐ কথাডা উত্থাপন করলাম। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সব ঘরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[সকলে নড়ে চড়ে বসে ও পরস্পররের কানে কানে যেন কী সব বলা কওয়া করে। একটা কলগুঞ্জন ওঠে।]

সংক্ষেপে সমস্যার কথা আমি বললাম, এইবার সকলে মিলে তোমরা কওয়া বলা কর, কী হলে কী হয়, কোন পথে এর এট্টা মীমাংসা হয়—বরকত বল।

বরকত। (নড়ে চড়ে) বলব বা কী আমি।

দয়াল। (কল্‌কে দিয়ে) আহা এ সম্বন্ধে তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের—(তামাক টানে)

[নেপথে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। না সে তো ঠিক কথা।—

নিরঞ্জন। তুমি যা ভেবেছ তাই বল।

[নেপথে খুব জোরে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

নিরঞ্জন। আরে ও মারা গেল কেডা।

[নেপথ্য থেকে উত্তর আসে— 'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।]

দিগম্বর। ত্রিলোচন মানে যে আমাদের নারানের বাপ। য়্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য।

সখীচরণ। হইছিল কী?

নিরঞ্জন। আবার হতে হয় নাকি কিছু।

বরকত। মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।

দয়াল। য়্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন থাকল যারা তাদের নিয়েই হচ্ছে কথা। ধান যে ওদিক সব পেকে ঝড়ে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।

ফকির। তারপর বরকত বল কী বলছিলে।

বরকত। কীই বা বলব।

দিগম্বর। যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না।

সখীচরণ। হ্যাঁ পাঁচজনে মিলে আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কী!

বরকত। মানে কথা হচ্ছে যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়; ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক যে বাতে সঙ্গে এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি। অথচ এদিকে আবার এমনিই অবস্থা— মাতব্বর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুইচার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকূল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকুখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল। এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত। হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্তে যখন খেই-ই পাচ্ছি নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্তে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর। আর এই অসুখ বিসুখ; একেবারে জেরবার করে ফেল্লে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমার তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে। মানুষ কি আর মানুষ আছে? না!

দয়াল। বুঝলাম, সব বুঝলাম; কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই সঙ্গাতি নেই, মন্বন্তরে একেবারে জ্বলে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

[ক্ষণকালের জন্য সকলেই চুপচাপ। একটু পরে নিরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে যেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে হাবভাবে মনে হয় যেন সে কিছু বলতে চাইছে।]

বরকত। নিরঞ্জন কিছু বলবে নাকি? তা বল না, জোরেই বল।

দয়াল। কী নিরঞ্জন কিছু বলতে চাও? তো বল না বল;

নিরঞ্জন। না এই বলছিলাম কী!

দয়াল। উঁ।

নিরঞ্জন। এই যে বরকত চাচা আর দিগম্বর যা বলছিল, অসুখ বিসুখ আর দুঃখ-কষ্টের কথা, তা সে কথা বলতে গেলে ওতো আমাদের জীবনের একরকম চিরসাথী হয়ে গেছে। এমন না, দু'দণ্ড বসে ঐ নিয়ে পাঁচজনে আলাপ-আলোচনা করলে তার উপশম হবে'খন।

দয়াল। ঠিক।

নিরঞ্জন। তা এখন যদি কিছু করতে হয় তো এই অবস্থার ভেতরে থেকেই যা হয় এট্টা কিছু করতে হবে।

দিগম্বর। তা তো বুঝেছে সকলেই। কিন্তু সেই 'যা হয় এটা কিছু' করা নিয়েই তো মুশকিল বেঁধেছে। কী সেডা?

বরকত। আদত কথাই তো তাই।—আচ্ছা—া-া—

দয়াল। বল কী বলছিলে।

বরকত। বলছিলাম বলি জমিদার বাবুরা, জমিদার বাবুরা যদি এই গে তোমার গত ক'সনের খাজনা—

দয়াল। মুকুব করে—

বরকত। হ্যাঁ।

দয়াল। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কে! খাজনা-পত্তর চাই, মুকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই। তবে আমার কথা হচ্ছে যে; প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকুখানি কী করতে পার তাই ভাবো—যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।

সখীচরণ। হ্যাঁ।

মানিক। না ও মিথ্যে। অনাহক—

দয়াল। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়।

[উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।]

বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।

ধ্বনি ওঠে—কী বিষয়, কী বলতে চাও তুমি' ইত্যাদি।

বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।

বরকত। গাঁতায় খাটলে!

দয়াল। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কমপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তের এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলিনে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধেক অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

[প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দ্য়াল মণ্ডলের যুক্তি।]

দিগম্বর। (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ তা হতে পারে।

সখীচরণ। না এ তো যথার্থ কথাই।

সুজন। তা মনে প্রাণে গাঁতায় খাটলে পরে ও একরকম করে ফসল—

গোলাম নবী। না এ লেজ্য কথা—

ফকির। ফসল না হয় তোলা গেল কিন্তু—

দয়াল। সেইটেই কি কম কথা হল বলে তুমি মনে কর মিঞা?

ফকির। না সে তো ঠিকই, তবে সমস্যা তো তোমার সেখানেই শেষ হল না। রক্ষে করবে কী করে তুমি এ ফসল। জমিদার আছে, মহাজন আছে, পাইকার আছে—

দয়াল। আসছে, পরে আসছে সে সব সমস্যার কথা।

সুজন। হ্যাঁ খাজনা সব বকেয়া পড়ে আছে জমিদারের ঘরে, তারপর মহাজনও পাবে থোবে অনেক কিছু। এখন ফসলটা উঠলেই পরেই তো সব চারদিক থেকে একেবারে শকুনের নাগাল উড়ে পড়বে'খন দ্যাও দ্যাও করে।

দয়াল। তা সে রুখতে হবে যে করেই হোক। এখন যারে নিয়ে খাজনা, সে তো আগে বাঁচবে না কী।

সুজন। তা সে কথা বোঝে কে!

দয়াল। বোঝে কে, বোঝাতে হবে। গায়ে জল দে বসে থাকলে হয়।

বরকত। হ্যাঁ সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে চলতে হবে। এখন আগে থাকতেই মীমাংসা কর কী করে তুমি সব কিছুর?

দয়াল। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে।

সুজন। না সে কথা তো একশ বার।

দয়াল। তো তবে! এক এক করে এসো।

দিগম্বর। না সে গাঁতায় খাটলে পরে—তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছ তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তুক।

[সকলে সমস্বরে 'নিশ্চয় খাটব', 'খাটব গাঁতায়' ধ্বনি করে।]

বরকত। হ্যাঁ ফসলটা তো আগে উঠে যাক ঘরে। তারপর মাঝপথে যে সব বাধাবিপত্তি আসবে, তা সে তুমি বলতে পার না এখুনি কী করব। তবে আমার মনে হয় যে একসঙ্গো মিলে মিশে চললে পরে—

দয়াল। (সঙ্গো সঙ্গো) মুশকিল আসানের পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দিগম্বর। আসল কথা হচ্ছে এখন ফসল—(আনন্দে) তা সে যা হোক ধান যদি একবার তুলতে পারি সব, তো আমি আমার জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্যে দিয়ে দেব।

বুধে। (বোকা গোছের একজন চাষী) আমি সব দিয়ে দেব। চার বিঘে জমির এট্টা ফসলও আমি নেব না।

দয়াল। (হেসে) সব দিয়ে দিলে তুই কী খেয়ে বাঁচবি রে আহাম্মক। দুস!

[সকলে হেসে ওঠে।]

ফকির। কার ফসল কেডা দেয়!—আরে জমি সে তো বেচে বসে আছে ও আগে থাকতেই; তার ধান দেবে কী রকম! ধান কি ওর! তারপর—

গোলাম নবী। এডা লেজ্য কথা বলেছে।

বরকত। হ্যাঁ তা আছে এ সব সমস্যা। আচ্ছা তা হলে এখন এই পর্যন্তই থাকল, তারপর সন্ধ্যের পর আবার দয়াল মণ্ডলের ওখানে বসে—যেও কিন্তু তোমরা সব সময়মতো।

দয়াল। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ সে সমস্যা এখনও আছে পরেও থাকবে, তবে বর্তমানে আমার কথা হচ্ছে কী যে কাল সকালবেলা থেকেই ধান কাটা শুরু করে দিতে হবে আর কী। আর বিলম্ব করলে চলবে না।

[সকলে গামছা ও দোলাই ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে দু-একজন করে ডানদিক ও বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে।]

দয়াল। (উঠোনে নেমে বরকতের মেয়েকে লক্ষ্য করে সহাস্য মুখে এগিয়ে গিয়ে) ওডা কেডা রে। কেডা ও য়্যাঁ।

নিরঞ্জন। (হাসিমুখে) বরকত চাচার মেয়ে। বড্ড নজ্জা।

দয়াল। তাই নাকি! (এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ রে, লজ্জা নাকি তোর খুব। (বরকতের মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে) তা লজ্জা হবে না। আমার যে ওর সঙ্গে নিকে হয়েছে সেদিন, না রে! বরকতের মেয়ে। যা! (মুখ লুকোয় বরকতের কোলের মধ্যে)

দয়াল। আচ্ছা দ্যাখ তো আমারে তোর পছন্দ হয় কি না, এই। আমারে বিয়ে করবি? (মেয়েটা চট্ করে দয়াল মণ্ডলের দাড়ি মুঠো করে ধরে। উ-হু-হু-হু, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। (ছাড়িয়ে নিয়ে। কী ডাকাতে বউ-রে বাব্বা, কী ডাকাতে বউ।

[সকলে হাসে, মেয়েটিও খিল খিল করে হাসে।]

[ফকির, নিরঞ্জন ও সকন্যা বরকত বাদে সকলের প্রস্থান।]

ফকির। হুঁঃ, গাঁতায় খাটলে।—গাঁতায় খাটলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁতায় খাটলে!—ধরো যে সমস্ত জমি কবালা হয়ে গেছে, কী করে সেইসব জমিতে গাঁতায় খেটে! আর তারপর ধান বন্ধকি রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই বা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর।

বরকত। আ-হা তা আছে সে সমস্যার কথা। এ তো আর কেউ অস্বীকার—

ফকির। তো তবে, ফলডা কী হবে এতে করে।

বরকত। তা বলি চেষ্টাডা' ত করতে হবে, না কী, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সব!

ফকির। ভালো, দ্যাখো—কর চেষ্টা।

[ফকিরের প্রস্থান।]

বরকত। ফ'করেডা যেন একেবারে কী রকম ধারা মানুষ!

নিরঞ্জন। (দাওয়ার ওপর বসে তামাক সাজতে সাজতে) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বরকত চাচা, বস; উঠে বস।

বরকত। হ্যাঁ বসি, বসি। (উঠে বসে)

নিরঞ্জন। (কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে) মানুষ, এ মানুষের হুঁ। কখনও কি ভাবতে পেয়েছি বরকত চাচা যে আবার ভিটেয় ফিরে আসব, আবার ঘর বাঁধব, নতুন করে আবার—

[বরকতের দিকে চেয়ে থাকে।]

বরকত। (তামাক খেতে খেতে) এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।

নিরঞ্জন। (ঘাড় নাড়ে) ঠিক ঠিক!—এক এক সময় মনে হয় বরকত চাচা, যে এ নৌকো বুঝি আর চললে না, থাকল আটকে পড়ে চোরাবালিতে ঐ মাঝ ডাঙায়। কিন্তু তারপরই দেখি যে না, আবার চলতে আরম্ভ করেছে নৌকো তর্ তর্ করে, টল টল করছে জল দরিয়ার। কোথায় চোরাবালি! অদ্ভুত, অদ্ভুত!

বরকত। সংসারের ধারাই তো এই। (দুজনে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ) রাত হয়ে গেল নিরঞ্জন, আমি তা হলে উঠি এখন। (উঠে পড়ে)

নিরঞ্জন। আচ্ছা যাচ্ছ তো তা হলে মণ্ডলের বাড়ি?

বরকত। হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো যেন।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।

[বরকতের প্রস্থান।]

(নিরঞ্জন ফিরে গিয়ে দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। নিরঞ্জনের বউ বিনোদিনী দাওয়ার ওপর কেরোসিনের একটা ডিবরি জ্বালিয়ে রেখে উঠোনের একধারে চুলো ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয় মাটির হাঁড়িতে। আবছা, অন্ধকারে মেটে হাঁড়িটা পরিবেষ্টন করে আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে।)

(গান)

বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য।
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়।।

[গান শেষে কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ।]

কুঞ্জ। (ক্লান্ত স্বরে) এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম। (দীর্ঘশ্বাস) হায় ভগবান!

রাধিকা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে।

নিরঞ্জন। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) কেডা ও।—আরে কথা বলে কেডা ওখানে!

কুঞ্জ। (থতমত খেয়ে) এই—এই আমরা?

নিরঞ্জন। (উঠে দাঁড়ায়) আমরা! আমরা, কেডা তোমরা! বলতে পার!

কুঞ্জ। আমরা—আচ্ছা এখানে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি কোথায়?

নিরঞ্জন। প্রধান সমাদ্দার—(দুই তিন পা এগিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) হ্যাঁ প্রধান সমাদ্দার, কিন্তু তাই কী, কেডা তোমরা!

কুঞ্জ। আমরা! (রাধিকার দিকে তাকিয়ে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের মতন—

নিরঞ্জন। কথা বলে না। আলোটা নিয়ে আয় দিনি বউ।

[বিনোদিনী কেরোসিনের ডিবরিটা হাতে করে এগিয়ে আসে। লাল আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত।]

দাদা দাদা তুমি!

[বিনোদিনী রাধিকাকে বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে।]

কুঞ্জ। (ভাঙা গলায়) সেই নিরঞ্জন বউ আমাদের। সেই নিরঞ্জন। (হঠাৎ ত্রস্তে) দেখি দেখি, তো দেখি, তো সেই যে আমি তোরে মেরেছিলাম মাথায় দেখি তো—(নিরঞ্জনের কপালে হাত বুলিয়ে) এখন আর ব্যথা নেই, না!

নিরঞ্জন। (অভিভূত হয়ে) না।

[উভয়ে আলিঙ্গান করে।]

কুঞ্জ। আমাদের নিরঞ্জন বউ।

কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর গৃহপ্রাঙ্গণ। সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে উঠোনটা। উঠোনের একধারে নিরঞ্জন মাথায় গামছার একটা ফেটা বেঁধে ধোপার পাটের মত উঁচু একটা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ধান ঝাড়ছে, আর তার নিচে বহু ধান জমে আছে দেখা যাচ্ছে। রাধিকাকে ধামা ভরতি করে সেই ধান সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে। উঠোনের বাঁদিকে একটা নতুন ধানের মরাইয়ের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় গামছার ফেটা বাঁধা একটা লোক সদ্য কাটা ফসলের বোঝা থেকে আঁটি আঁটি ধান নিরঞ্জনের হাতের কাছে জোগান দিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর একজন লোক ধান ঝাড়ছে। আর বিনোদিনী কুলো করে ধান উড়োচ্ছে। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সব খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে দূর থেকে। অর্ধেক ধামা ধান ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের ওপর প্রায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রাধিকা দু'হাত কুলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে হাসছে মুখ টিপে আর ধান ওড়াচ্ছে। নিরঞ্জন কয়েক আঁটি ধান উপর্যুপরি কয়েক বার ফ্রেমের উপর আছড়ে বাঁদিকের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর হাত দিয়ে কপালের ধান মুছে ফেলে হঠাৎ বিনোদিনীর দিকে নজর করে।

নিরঞ্জন। (হাস্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি) দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো! ওমা, দ্যাখো গলে পড়ল! খুব ধান তুলছিস যাহোক! এই রকম কাজ করলেই হয়েছে আর কী!

বিনোদিনীর হাসি আরও বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধানের ওপর

ওমা, দে-দেখছ কাণ্ড! (কৃত্রিম রোষে) বউদি, তুমি বলছ না কিছু ওরে, আ গেল যা। কথা শুনে হাসতে হাসতে রাধিকার হাত থেকেও যেন কুলো পড়ে যাবার উপক্রম হয় হয়।

ওমা, তোমরা সকলেই তা হলে। কী হয়েছে কী বলদিনি তোমাদের সব?

বিনোদিনী। (হাসি সামলে) হাতির পা দেখিছি। (হাসতে থাকে)

[রাধিকাও হাসে।]

নিরঞ্জন। (কয়েক আঁটি নতুন ফসল নিয়ে) সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

[ধান ঝাড়্‌তে থাকে।]

রাধিকা। (হাসি থামিয়ে এক কুলো ধান তুলে বিনোদিনীর প্রতি) নে, কাজ কর কাজ কর। বেশি হাসি ভালো না। (হেসে নিরঞ্জনের দিকে ইঙ্গিত করে) যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না, জানলি!

নিরঞ্জন। (রাধিকার প্রতি) ঐ যে আসছে রামসন্না, দেখাবে'খন হাসি। (রাধিকা কাজে মন দেয়। বিনোদিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ধান তুলতে থাকে। হাসো, এইবার হাসো!

[ধান তুলতে থাকে।]

কুঞ্জ। (রাধিকার দিকে এগিয়ে) কী, এগারো কাঠার মতো হয়েছে! তো তুলে দাও। (প্রসন্ন হেসে) আমার ধানডাই আগে পড়ুক।

রাধিকা। এগারো কাঠা কেন, দশ কাঠা বল।

নিরঞ্জন। দশ কাঠাই তো। তাই ঠিক হল না মণ্ডলদার বাড়ি বসে।

কুঞ্জ। দশ কাঠা। আচ্ছা তো আর এক কাঠা নয় আমি বেশিই দিলাম নিজের থেকে। এগারো কাঠা দাও। বেরিয়ে গেল যখন একবার মুখ থেকে—

নিরঞ্জন। (প্রসন্ন মুখে) তা সে বোঝো তুমি। মন চায় দ্যাও। ধর্মগোলায়ই তো যাবে, দ্যাও।

[দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী ধর্মগোলায় যাবে?

[রাধিকা ও বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দেয়।]

কুঞ্জ। এই যে, মণ্ডল এয়েছে।—না এই ধানের কথা হচ্ছে। বলছি বলি দাও তা হলে আমার ভাগডাই আগে দেই ধর্মগোলায়।

দয়াল। (হেসে টাকে হাতে বুলিয়ে) ভালো ভালো। তা উঠে গেছে তো সব ধান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ তা প্রায় গেছে।

দয়াল। যাক্ (রাধিকার প্রতি হেসে) এইবার একদিন নতুন চালের পিঠে খাইয়ে দিও যেন বউমা।

কুঞ্জ। (হেসে) তা সে তো খাওয়াতেই হবে। নবান্ন আসছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা মণ্ডলদা, এবার নবান্ন উৎসব হবে না!

দয়াল। নবান্নের উৎসব, হ্যাঁ, কেন হবে না! নিশ্চয় হবে।

নিরঞ্জন। (হেসে) প্রতি বছর যে রকম হয় এবারও একেবারে সেই রকম ধূমধাম করে। লাঠা-টাঠি খেলা হবে।

দয়াল। হ্যাঁ।—আচ্ছা এবার আমি তোর সঙ্গে লড়ব, তৈরি হয়ে থাকিস।

নিরঞ্জন। (হেসে) আমার সঙ্গে, আচ্ছা! আচ্ছা!

দয়াল। (স্মিত মুখে) হাতলাঠি কিন্তুক।

নিরঞ্জন। আচ্ছা তাই।

দয়াল। হ্যাঁ; আর যদি না পারিস?

নিরঞ্জন। (উৎফুল্লভাবে) না পারি তো এক সের জিলিপি।

দয়াল। (কুঞ্জ ও আর সকলের প্রতি) শুনলে কিন্তু তোমরা সব। এক সের জিলিপি খাওয়াবে নিরঞ্জন আমারে হেরে গেলে পরে। (নিরঞ্জনের প্রতি) আবার দেখিস।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (হেসে) হ্যাঁ সে আমি দেখিছি, দেব এক সের তা কী হয়েছে।

[দয়াল গমনোদ্যত।]

কুঞ্জ। মণ্ডলদা চললে নাকি?

দয়াল। হ্যাঁ মাঠের থেকে ঘুরে যাই একবার।... আজ তো বরকতের পালা, নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, আচ্ছা তো এগোও তুমি আমি যাচ্ছি।

[দয়ালের প্রস্থান।]

নিরঞ্জন। (গদগদ হেসে) উ-উ-উঃ, মণ্ডলদা যে সে একেবারে—

রাধিকা। (ঘোমটা খুলে) বুড়ো হলেও মণ্ডলদার তো এখন বেশ শখ আছে দেখি।

বিনোদিনী। (হেসে) মণ্ডলদা কিন্তু বেশ ভালো লাঠি খেলা জানে, হ্যাঁ। কথা তো দিলে, শেষ কালে দশজনের সামনে বুড়োর কাছে আবার অপদস্থ না হও। তা হলে আর—

নিরঞ্জন। ওগো হ্যাঁ, রাখদিনি তুমি! কত মাতব্বর মণ্ডল দেখে এলাম!

রাধিকা। (ঠাট্টার সুরে হেসে) ও এক সের জিলিপি তোমার গেছে যাই বল!

কুঞ্জ। ন্যাও কী হল, হয়নি এগারো কাঠার মতো এখনও! না, হাসবে আর শুদ্ধু মস্করা করবে তার কাজ হবে কী করে!

রাধিকা। (কৃত্রিম রোষে) ওমা, তা তুলবে তো তোলো না ধান ধর্মগোলায়, আমি কি বারণ করছি। আ গেল যা! একেবারে খেয়ে ফেললে কানের মাথা এগারো কাঠা এগারো কাঠা করে।

নিরঞ্জন। তা হয়ে তো গেছে, এইবার তুলে ফ্যালো না।

রাধিকা। ভর লো বিনো ধান কাঠায়।

কুঞ্জ। ধর্মগোলায় ধান দিবি কালো মুখ করে যেন দিসনি বউ। স্মরণ করে দ্যাখ, এই ধান—

রাধিকা। ওমা, কালো মুখ করব ক্যানো। ধর্মগোলায় ধান উঠবে তার আবার—ন্যাও ধরো।

(কুলো নামিয়ে রেখে রাধিকা বিনোদিনীর কাছ থেকে ধামা ভরতি করে ধান নিয়ে কুঞ্জর হাতে দেয় তার কুঞ্জ গোলার বন্ধ পথে ধান চালতে থাকে। নিরঞ্জন যেমন তেমনই ধান ঝাড়তে থাকে। বিনোদিনী আর একটা ধামার ধান ভরতি করতে থাকে।)

কুঞ্জ। (গোলায় ধান ঢালতে ঢালতে) কার ধান—আর কে দেয়! এই জমি বিক্রি করা নিয়েই বা কত, হুঁঃ! সংসার, সংসার—আসবার সময় দেখাডা পর্যন্ত হল না। কোথায় যে গেল! হয়তো মরেই গেছে য়্যাদ্দিন—যাগ্‌গে আমার কাজ আমি করে যাই।

রাধিকা। (দ্বিতীয় ধামা ভরতি ধান নিয়ে) কই গো ধর।

কুঞ্জ। ও, এই যে, ন্যাও এই—

[খালি ধামাটা কুঞ্জর হাত থেকে রাধিকা বিনোদিনীর হাতে দিল।]

রাধিকা। নে লো।

[গায়ে ঢিলে আলখাল্লা পরা জনৈক ফকিরের প্রবেশ। হাতের সাদা চামর দুলিয়ে গাইতে লাগল।]

পেছনে দুজন ফকিরের দোহার, ধুয়া ধরে চলে—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম'।

ফকির। (ডাক ছেড়ে বিড় বিড় করে কী সব বলতে লাগল) ও-ো-ো-ো (বিড় বিড় করতে লাগল)
আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
(এখন) বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
ছয় মাসের মধ্যে তার এন্তেকাল ফরমায়।।
খলিলপুরের জব্বর মিঞার দুঃখের কথা জানো।
প্রতিবেশী পতিত পাবন বৈরী যে কারণ।।
কালান্ত আকালে এমন কত চাষী ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।

নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।।
কোমরে কাপড় নাই বস্ত্র অনটন।
গৃহস্থের হইল দায় লজ্জা নিবারণ।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে লজ্জা ঢাকে
বাঁচিয়া মরিয়া আছে গৃহস্থ সজ্জন।
ঘরে ঘরে অপমৃত্যু কারণ অনশন।।
মাঠে ঝরে পাকা ধান আর চোখে পানি।
শক্ত করে ধরো হাল হালে পাবে পানি।।
এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।।
আমন ফসল শুভ-লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্থের নয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়।।

পূর্ণ ধুয়া— আপনি বাঁচলে তো...দোস্তালি পাতান।।

ফকির। মা...গায়েন ফকিরকে মুশকিল হইতে আসান করবেন।

রাধিকা ছোট একটা বেতের সাজিতে ভরে ফকিরের ঝুলিতে ধান ঢেলে দেয়।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। সূর্য ডোবে ডোবে। গোধুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে চরাচর। আজ নবান্ন-উৎসব। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাই ভিড় করছে এই মরা গাঙের ধারে। স্বাস্থ্যহীন শরীরগুলোতে আজও বিগত আকালের কলঙ্কছাপ সুস্পষ্ট। তবু আজ এই স্বর্ণসন্ধ্যায়, এই মরা গাঙের ধারে চলেছে নবান্নের উৎসব। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে সব কৃষান-কৃষানীরা। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো সভায় যোগদান করেছিল বিভিন্ন বেশে এই উৎসবে আজ তারা সকলেই সমুপস্থিত। সকলেই গৃহস্থ চাষী। বেশির ভাগ লোকেরই খালি গা, সঙ্গে একখানা গামছা—মাথায়, কোমরে বা কাঁধে।

নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। আর থেকে থেকে গরুর গলার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢোলের শব্দ দু'চারবার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকেই।

পর্দা সরে যেতেই দেখা যাচ্ছে স্টেজের একদম পেছন দিকে Shadow play দেখবার জন্যে চার ফুট উঁচু একটা প্রাচীরের সামনে চাষী মেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে ব'সে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো তাদের সব তৈলাধিক্যে চকচক করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ।

আর সামনে খালি গায়ে চাষীরা লড়ায়ে মোরগ কোলে করে বসে আছে। মোরগদের পায়ে সুতো বাঁধা, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে শব্দ করে উঠছে। চাষী রমণীদের গান শেষ হতেই মোরগের লড়াই শুরু হল। ভিড় করে দাঁড়াল সব দর্শকরা। জোড়ায় জোড়ায় লড়াই। যে বাজী জিতল তাকে নতুন একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল।

মোরগের লড়াই শেষ হতেই চাষীদের একটা গান শুরু হল, আর সেই গান ছাপিয়ে নেপথ্যে উঠল ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ—গরু-দৌড় হচ্ছে। এই দৃশ্যটি Shadow play করে দেখাতে হবে। পিচবোর্ডের গরু বা বড়ো পুতুলের সাহায্যেও এটা দেখানো যেতে পারে। এই সময় গরুর গলার ঘন্টাগুলো সব একসঙ্গে জোরে ঝম ঝম করে বাজতে থাকবে আর নেপথ্যে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ হবে। অনুসন্ধান করে যার গরু বাজি জিতবে জানা যাবে তাকে একখানা নতুন কাপড়, একখানা গামছা আর একখানা নতুন লাঙল উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

গরু দৌড় শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল তুমুল ঢোল আর কাঁসর বাজনা। এইবার লাঠিখেলা। ঢোলের সঙ্গে তাল রেখে বেতের ঢাল আর হাতলাঠি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হল নৃত্যছন্দে। দু-একটা লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডের জোর একটা লড়াই-এর শুরুতে প্রধান এসে হাজির হল।

[(কৃষকরমণীদের গান)]

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।

চারজন চারজন আটজন লোক ঝুঁটিওয়ালা আটটা মোরগ কোলে করে বসে আছে। প্রত্যেকটি মোরগের পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে বাঁহাতের তর্জনীর সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধা আছে; উড়লেও উড়ে যেতে পারবে না। সকলেই যে যার মোরগের তারিফ করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। গান শেষ হতেই কথাবার্তা শুরু হল।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। (মোরগ উড়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরে) আরে র-র-বেটা-র। বাজি জিতবে বলে একেবারে তর সইছে না, য়্যাঁ!

২য় সারির ৪র্থ ব্যক্তি। (মোরগ ডানা ঝাপটাতেই)। বাপুরে, বাপুরে বাপুরে তেজ। মেজাজ চড়ে গেছে বাবুর কথাবার্তা শুনে। দ্যাখো না, একেবারে ডগমগ করছে চোখ! লড়বা, লড়বা, সবুর।

২য় সারির ৩য় ব্যক্তি। (মোরগ কোলে করে) আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! (মোরগকে লক্ষ করে) সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির প্রতি) তা ও বাচ্চাডারে ধরে এনেছ কেন মিঞা? সব ডাঁটো ডাঁটো মোরগ এক বাজির তালও সামলাতে পারবে না ঐ বাচ্চা।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু মুখ টিপে হেসে হেসে) কোন বাচ্চা!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। তোমার কোলের মোরগের কথা বলছি। বলছি বলি আনলে যখন তখন ভালো দেখে একটা খাসি আনলেই পারতে!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু উপেক্ষার হাসি হেসে) বলতে পার!

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। (২য় সারির ১ম ব্যক্তির প্রতি) বলি খুব তো লম্বাই চওড়াই বাত বলছ। ও মোরগ কোথাকার জানো?

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (থতমত খেয়ে) কোথাকার!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ৩য় ব্যক্তির প্রতি) আরে চুপ করে যাও; কান আছে শুনে যাই।

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। হুঃ চ'রে মোরগ। ওর জাতই ঐ, দেখতে ছোটো। কিন্তু একেবারে বিচ্ছু।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। কত বড়ো বড়ো পালা খাসি বলে তিন ঝাপ্পড়ে লটকে ফেলে ভুঁই-এ! বিষটা তো জানো না এর; তাই বাচ্চা বলছ।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির মোরগের ঠোঁটে হাত দিয়ে) ঠোঁটটাই দ্যাখো না, শক্ত যেন একেবারে ল্য। ব্যাটা ঠোকরায় তো না যেন ছুরি চালায়।

[হাতের টিপ খেয়ে মোরগটা ডেকে উঠল।]

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (হতাশ হয়ে) আমার পালা খাসি।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। ও দেখেই বুঝিছি, আবার বলবা কী। ভাত খেগো তো!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ।

[১ম সারির ২য় ব্যক্তি অশ্রদ্ধার ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী বসে আছ যে তোমরা সব মোরগ কোলে করে। এইবার শুরু করে দাও।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ তো জজেরা এলেই এবার আরম্ভ হতে পারে লড়াই।

দয়াল। জজেরা, তা এসে গেছে তো সব জজেরা। (হাঁক দেয়) বলি ও কুঞ্জ, আর বরকত মিঞারে সঙ্গে নিয়ে এদিকে এসো। মোরগের লড়াইডা হয়ে যাক। (প্রতিযোগীদের

প্রতি) তো ন্যাও শুরু করে দাও এইবার। (মোরগগুলো দেখে) জবর জবর মোরগ এয়েছে তো দেখে এবার।

(প্রথম ও দ্বিতীয় সারির পিছনে জজেরা ও জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়। মাঝখানে জোড়ায় জোড়ায় লড়াই শুরু হয়। দর্শকেরা লড়াইয়ে রত মোরগদের তারিফ করে—বারে বেটা, আহা, াহা, মার প্যাঁচ ঝাপটা মার মার ঝাপটা, বেশ, বেশ ইত্যাদি।

নেপথ্যে ঘুঙুরের বোল সহ মেয়েদের গান আবার শোনা যায়। মিনিট দুই তিনেক সময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই শেষ হয়। দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তির মোরগ বাজি জেতে। তখন তাকে সবাই মিলে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সর্বজন সমক্ষে!)

কুঞ্জ। (সহাস্য মুখে ঘোষণা করে) ফেকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্যে ফেকু মিঞারে উপহার দেওয়া হল—এই একখানা গামছা আর একখান কাস্তে। ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।

ফেকু মিঞা। (সহাস্য মুখে) আরে দ্যাখো কী করে, পড়ে যাব পড়ে যাব।

সকলের গান

(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।
দেমাকে মিঞার দাড়ি ফুলে উঠেছে।
(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।

দুই চার ফেরতা গাওয়ার পর সামনের জনতা পাতলা হয়ে যায়। ত্রস্ত গতিতে সব পেছন দিকে ছুটে চলে। এই সময় নেপথ্যে ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে রিনটিন টুং টাং ঝমা ঝম্ ঝম্ ঘন্টার আওয়াজ হতে থাকবে। Shadow play-র সাহায্যে দু'চারটে গোরু বৃহদাকারে দেখানো যেতে পারে একদম পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দার গায় ছায়াছবিতে গোটা দুয়েক গোরুর ঊর্ধ্ব পুচ্ছ দেখিয়েও গতিবেগটা বোঝানো যেতে পারে। নেপথ্যে এই সময় চলতে থাকবে অবিরাম দ্রুত হুড় হুড় হুড় হুড় আওয়াজ। হট্টগোলের মাঝখানে দু একবার হাম্বা রবও শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একজন চাষীকে কাঁধে করে জনতা হর্ষধ্বনি করতে করতে ঢুকল।

নেপথ্যে থেকে শোনা যায়, আরে গোরু জিতল কার? মঞ্চের উপর ভিড়ের ভেতর থেকেই উত্তর হল, রহমৎউল্লার। রহমৎউল্লাকে ঘাড়ে করে চাষীরা নাচছে।

কুঞ্জ। (গণ্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে জোর গলায় ঘোষণা করে) প্রতি বছর, প্রতি বছর যে রকম গোরু আসে এমন দিনে, এবার তেমন মোটেই আসেনি। কারণ বলদ যা ছিল, প্রায়ই সব মরে গেছে, আর যে-গুলো এখনও টিঁকে আছে ঝড়-ঝাপটার পর, সে-গুলিও খুব কাহিল। প্রথমত গোরু-দৌড় এবার বন্ধই রাখা হবে বলে সাবস্ত্য হইছিল। তারপর অবশ্য

মণ্ডলের কথায়, গোরু দৌড় হবে ঠিক হল। মণ্ডল বলিছিল, গোরুই আমাদের এ উৎসবের প্রাণ সুতরাং কাহিল হোক আর যাই হোক গোরু দৌড় এবারেও হবে। বলদগুলোর শরীরে তাকত নেই, তাই গোরু-দৌড় এবার তেমন জুত্‌সই হল না। তা সে যা হোক, আসেনি কারও তেমন জুতসই বলদের সংখ্যা এবারে একেবারে কম হয়নি। আর যে দৌড় হল, তাতে করে রহমৎউল্লার গোরু বাজি জিতেছে। তাই উপহার হিসেবে রহমৎ ভাইকে এবার একখানা নতুন কাপড় আর একখানা লাঙল দেওয়া হবে। লাঙলখানা দিয়েছেন আমাদের দয়াল মণ্ডল।

(জনতা রহমৎউল্লাকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে আবার একবার সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরে নামিয়ে দেয়। রহমৎউল্লাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। দয়াল মণ্ডল সহাস্য মুখে রহমৎউল্লার হাতে একখানা নতুন কাপড় ও একখানা লাঙল তুলে দেয়।)

দয়াল। আসছে বারে ভালো বলদ আনা চাই।

[রহমৎ গদগদ হয়ে হাসে আর জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে থাকে।]

কুঞ্জ। জোরসে হাল চালাবা এবার আর কী!

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওয়াজ। ছন্দ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠিখেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপর নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপিনপরা দুজন লাঠিয়ালকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁহাতে বেতের ঢাল, আর ডানহাতে হাতলাঠি (নড়ি)। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল। প্রথম রাউণ্ড শেষ হতেই ঢোলের আওয়াজ সাময়িকভাবে তিনবার দুনে বেজে বন্ধ হতে না হতেই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দুজন লেঠেলের মল্লভূমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল দুনে নৃত্যছন্দে। এবারকার লেঠেলরা খুব কায়দা করে খেলা দেখাল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে টিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছন্দ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপথ্যে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি।

১ম দর্শক। উত্তরে মেঘ হয়েছে, এট্টু তাড়াতাড়ি নাও।

কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল ঢোলের বাজনা আর কাঁসির শব্দ থেকে থেকে। হঠাৎ লাঠিখেলার মাঝখানে দু চারজন দর্শকের দৃষ্টি গিয়েপড়ল প্রধানের ওপর। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাকাতে লাগল তারা প্রধানের দিকে—যেন কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না লোকটাকে। প্রধান গাঁই-গুঁই শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ জনৈক দর্শক চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।

২য় দর্শক। (খুব জোরে চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে) মোড়ল, মোড়ল এয়েছে! মোড়ল!

(আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে প্রধান এগিয়ে আসে মাথা নাড়তে নাড়তে আর হাসে।

সকলের দৃষ্টি প্রধানের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়। জনতা এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঢোল থেমে যায়।)

প্রধান। আমি এইছি, এসে পড়েছি আমি।

(জনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে লাল কৌপিন পরে দাঁড়িয়ে আছে দয়াল। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার অপূর্ব এক আনন্দে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। কুঞ্জ, নিরঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে।)

আমি এসে পড়েছি। এসে পড়েছি আমি।

কালো একখানা মেঘ উঠে আসে ধীরে ধীরে উৎসবের মাথার উপর।

দয়াল। (বিশ্বাস যেন হয় না, তাই নিম্ন স্বরে) প্রধান, প্রধান এলে! প্রধান!

কুঞ্জ। (চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে প্রধানকে) জেঠা! জেঠা! জেঠা!

প্রধান। (স্মরণে আসে কি আসে না তাই দ্বিধা) য়্যাঁ, য়্যাঁ, কুঞ্জ আমার কুঞ্জ!

[কুঞ্জর মুখটা দু-হাতে ধরে দেখতে লাগল!]

কুঞ্জ, কুঞ্জ!(গরু গরু মেঘের ধ্বনি)

দয়াল। (এগিয়ে এসে) প্রধান চিনতে পারো এই বুড়োরে য়্যাঁ, চিনতে পারো!

(এক গাল দাড়ি মাথার চুলের জট থেকে মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রধানের! সেই বিকৃতদর্শন মুখখানার ওপর যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল শাণিত দৃষ্টিটা।)

প্রধান। (তর্জনী তুলে) তুমি, তুমি বাবুরালি—(পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দয়াল) য়্যাঁ, য়্যাঁ তুমি, কৃপনাথ।

[দয়াল কোনো সাড়া দেয় না!]

তুমি, তুমি, কেডা তুমি? (কৌতূহলী করুণ হেসে) দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল!

দয়াল। য়্যাঁ, স্মরণে আসে, প্রধান?

প্রধান। (হেসে তর্জনী তুলে) হ্যাঁ, আসে স্মরণে আসে। দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল।

(দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে প্রধানের। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।)

দয়াল। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।

প্রধান। নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল। যদি আসেই, তো ডর কিসের!

প্রধান। ডর নেই! দুখেরে ডরাও না; য়্যাঁ, ডরাও না দুখেরে! বেশ, বেশ, বেশ ভলো। ভালো। ভালো।

দয়াল। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনে তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।

প্রধান। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আবার আসে! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!

(গুরুগুরু মেঘের আওয়াজ। জলভরা কালো মেঘের একটা অংশ উঠে এল উৎসব অঙ্গনের এক চতুর্থাংশের ওপর কালো ছায়া ফেলে।)

(মেঘের দিকে লক্ষ্য করে) এই দ্যাখো নিচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ঐ ঐখানে, ঐ ওপরে, দ্যাখো কত বড়ো একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড়ো একটা গোলযোগ! কত বড়ো একটা—

[বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।]

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!

প্রধান। (জোরে চীৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল!

যবনিকা

৮৬.১৪ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক)

আবার সেই আমিনপুর। কিন্তু এ যেন এক নতুন গ্রাম। হকচকিয়ে যায় তারা। এখানে বাড়ি উঠেছে। তাই কুঞ্জ বলে, এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম।' রাধিকা ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিরঞ্জন। তারপর দুই ভাই আর দুই বৌ-এর মিলন হয়—এক বিষাদঘন মমতামেদুর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে।

[৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

অপরদিকে। প্রধান, কুঞ্জ আর রাধিকাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে এক হাসপাতালে। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত প্রধানের চোখ দিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাপারে নিদারুণ দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। [**৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য**] তারপর ওখান থেকে প্রধান ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে গ্রামে। আমিনপুরে সে যখন ফিরে আসে তখন গোটা আমিনপুরের চালচিত্রটাই গেছে বদলিয়ে। দুর্ভিক্ষ আর হাহাকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে আমিনপুর। ফিরে পেয়েছে তার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। নবান্নের উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রামটা। নবান্নের উৎসবমুখর আনন্দঘন দিনে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাদের প্রাণের প্রধানকে ফিরে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে। দয়াল জানায়—'আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।' [**৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য**] শোষণমুক্ত সমাজের

স্বপ্ন নিয়ে তার আনন্দ, তার উৎসবের আয়োজনে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণায় নাটকের পরিসমাপ্তি। 'নবান্ন' নাটকে এটি আর একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইঙ্গিত, এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণচেতনা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটকের উজ্জ্বলতম দিক। যে মানুষ একসময়ে প্রাণঘাতী দাঙ্গার সামিল হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, সেই মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি রচনা করেছে।

প্রধানও সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় সে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার সুস্থিরতায় হৃত ভারসাম্য পুনঃ অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সে নবান্নের উৎসবে যোগ দেয়। 'নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো! সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন।' কিন্তু তবুও মনের তলায় তির তির করে বয়ে চলে সংশয়ের স্রোত। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আর আসবে না'

প্রধানের আশঙ্কার উত্তর দেয় দয়াল বলিষ্ঠ বিশ্বাসভরা দৃঢ় সংলাপে—'জানি প্রধান মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, যে গতবারর মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব...ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।...কিছুতেই না। এদের নিতে হলে...এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

[৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

নবান্নের উৎসব মুখর দিনে দয়ালের প্রত্যয় দৃপ্ত শপথের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর সমাপ্তি সংলাপ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে এই নাটক প্রতিরোধের নাটক। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে গতানুগতিকতা বর্জিত 'নবান্ন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন, একটি অনন্য আস্বাদ, একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তের বার্তাবাহী।

৮৬.১৫ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) তা ও বেঁচে থাক বাবা..... , বেঁচে থাক আমার..... , না হয় ..... পয়সা নেবে, জিনিষটি তো ঠিক পাওয়া যাবে।

(খ) থাকবার মধ্যে..... ছিল, গেল। গেল। পথে নেমে দাঁড়াবারও ..... সইল নারে কুতুও, ... ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব ..... হয়ে গেল।

(গ) আপনি বাঁচলে তো ..... মিথ্যা সে ..... । ..... যতেক চাষী ..... পাতনি।

২। (ক) "কুঞ্জ ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? কাকে বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

(খ) "আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(গ) " মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ইয়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচিতে চাইবেই।"—কোন পটভূমিকায় কে এই কথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) "এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।" কোন্ প্রসঙ্গে কে কাকে এ কথা বলেছেন?

৩। শব্দার্থ লিখুন ঃ

লোভানি, খেলাপ, শরম, ইজ্জৎ, অনাহক, গাঁতা, 'ব্যাদরা ছেলে' আহাম্মক।

৮৬.১৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১। উদ্দেশ্য পর্যায়ে ৮ টি উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া আছে। এ থেকে যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। (ক) আগুন (১৯৪৩), খ) ১৯৪৪, গ) ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ছাড়ো ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি।

(খ) মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।

৩। 'অরণি,দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের, শ্রীরঙ্গাম।

৪। (ক) ৬.৪ -এ মূলপাঠ ১-এর ক) অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

(খ) অঞ্জনগড়, কেরানী, ল্যবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী—এর যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। এই পর্বের নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের কৃষক, শ্রমিক অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের শোষণ-বঞ্চনা। লক্ষছিল এই মানুষগুলির মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠনের মাধ্যমে নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা।

অনুশীলনী—২

১। (ক) ব্ল্যাক মার্কেট, মজুতদার, চতুর্গুণই।

(খ) খরখানাই, তর, পথই, একাকার।

(গ) বাপের নাম, বয়ান, হিন্দু, মুসলিম, দোস্তালি।

২। (ক) ৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি, ভূপতি শহীদ হয়েছে। এই শূণ্যতা বোধ থেকে প্রধান কুঞ্জকে চিত্ত বিহ্বলতা জনিত কারণে এই উক্তি করেছেন।

(খ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুলিশী অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত বাংলার গ্রামবাসীরা যখন ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে তখন এ দৃশ্য দেখে পঞ্চাননী ক্ষোভে দুঃখে কুঞ্জকে একথা বলেছেন।

(গ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে 'দয়াল' এই কথাগুলি বলেছেন। যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তরে-এ যে মানুষগুলি গাঁ ছাড়া হয়েছিল, দুর্যোগের অবসানে তার একে একে গ্রামে ফিরেছে। নতুন করে ঘর বেঁধে, জীবনযাত্রা শুরু করার কালে একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। দিগম্বরের কথায় সামান্য হতাশার সুর বাজতেই বললেন, মানুষতো বাঁচতেই চায়। এটাইতো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মন্বন্তরে সর্বহারা নিরঞ্জন দেখ না নতুন করে ঘর বেঁধে সকলকে নিয়ে সভা করে , আগামী দিনের সংকট উত্তরণের কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। নিরঞ্জন বলে দুঃখ-কষ্টের কথা তো স্বাভাবিক, সে তো মানুষের চিরসাথী, দু-দণ্ড বসে আলাপ আলোচনা করলে খানিকটা উপশম হতে পারে। সকলে এত সম্মতি দেয়। উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তই তাৎপর্য হিসাবে প্রতিপন্ন।

(ঘ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গ্রামের মানুষজন এক একে ফিরে এসে নিজেদের পারস্পরিকঅভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নিরঞ্জন বরকত একথা বলেছেন।

ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি সারাই করে নিজেবাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কখনও দুর্যোগ যেমন আসে, তার অবসানও হয়—মানুষের জীবনযাত্রা কখনই নিস্তরঙ্গ নয়, তার উত্থান-পতন আছে। ধৈর্য্য ধরে তাকে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। প্রধান বরকত তার অভিজ্ঞতা থেকে নিরঞ্জনকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩। লোক দেখান, কথা না রাখা / প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরা, লজ্জা, সম্মান, অন্যায়/ অসঙ্গত, যৌথ খামার, দুষ্টু/বেয়ারা ছেলে, বোকা।

৮৬.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য — নবান্ন প্রথম (সংস্করণ)।

২। দর্শন চৌধুরি — গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।

৩। দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার মণ্ডল } প্রসঙ্গ নবান্ন (লিপিকা)

৪। মন্দিরা রায় — বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত।

৫। সুধী প্রধান — নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব।

একক ৮৭ ❒ নবান্ন নাটকের আলোচনা

গঠন

৮৭.১ উদ্দেশ্য
৮৭.২ প্রস্তাবনা
৮৭.৩ মূলপাঠ ১ ঃ নবান্ন—রচনা, দেশকাল ও নামকরণ
৮৭.৪ মূলপাঠ ২ ঃ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
৮৭.৫ সারাংশ
৮৭.৬ অনুশীলনী ১
৮৭.৭ মূলপাঠ ৩ ঃ নবান্ন নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা
৮৭.৮ মূলপাঠ ৪ ঃ নবান্ন নাটকের গঠন
৮৭.৯ সারাংশ
৮৭.১০ অনুশীলনী ২
৮৭.১১ মূলপাঠ ৫ ঃ নবান্ন নাটকের চরিত্র আলোচনা
৮৭.১২ মূলপাঠ ৬ ঃ নবান্ন নাটকের সংলাপ ও গান
৮৭.১৩ সারাংশ
৮৭.১৪ অনুশীলনী ৩
৮৭.১৫ মূলপাঠ ৭ ঃ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান
৮৭.১৬ মূলপাঠ ৮ ঃ 'নবান্নে'র শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য
৮৫.১৭ সারাংশ
৮৭.১৮ অনুশীলনী ৪
৮৭.১৯ উত্তর-সংকেত
৮৭.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৮৭.২১ অতিরিক্ত পাঠ — পরিশিষ্ট ১ ও ২

৮৭.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী নাটকটিতে আপনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি সম্পূর্ণত পড়েছেন। নাটক পাঠ সূত্রে আপনি একদিকে যেমন লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকর্মের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন, সেইসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন ও প্রসঙ্গত নবান্ন নাটকের ভূমিকায় দেখেছেন।

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য ও সেইসঙ্গে সংলাপ ও মঞ্চ পরিচালনার সম্পর্কে জানবেন।

- জানবেন কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির সূচনা।
- নাটকের 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।
- নাটকের নয়া ভাবনা ও চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ করুন।
- নাটকটিতে কয়েকটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৮৭.২ প্রস্তাবনা

ভাববাদী শিল্পী দার্শনিকরা মনে করেন, দৈবানুগ্রহে তাদের অনুভবে, মননে, নতুনতর ভাবোদয় হলে, সেটি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত, তাঁদের নিস্তার নেই। কিন্তু যাঁরা বস্তুবাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা বস্তুবিশ্বের সার্বিক কল্যান ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'নবান্ন' নাটক রচনার পেছনে তাই সক্রিয় দেখা যায় সেই সময়ের সমাজমনস্ক ইতিহাস রাজনীতি সচেতন কিছু মানুষ তাঁদের উন্নত চেতনা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন গানে,গল্পে, নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশে উদ্যত হলেন। গণনাট্য আন্দোলন তাঁরই ফলশ্রুতি।

তাই এঁদের নাট্য প্রযোজনায় বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা গেল। নাটকে কৃষক শ্রমিকের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এলো। ব্যক্তি চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি-যুক্তির প্রাধান্য, শ্রেণী চেতনাসূত্রে সমাজে শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র নাটকে দেখা দিল। ধনী জমিদার এবং শাসনযন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষগুলিরজন্য। মঞ্চ ও প্রয়োগ কলায় সমন্বয়, সৃষ্টি করে নানা বৈচিত্র্য আনা হল। এই প্রেক্ষপটে নবান্ন নাটক রচনাও তার ব্যাপক মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন, গণনাট্য সংঘের পতাকা তলে। 'নবান্ন' তাই গণনাট্যের নাটক, গণআন্দোলনের নাটক। আর এখানেই তার সিদ্ধি, তার সাফল্য আর ব্যর্থতা। নবান্ন' পাঠ ও আলোচনায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

৮৭.৩ মূলপাঠ ১ : রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪- এ (দ্বিতীয় ১৯৪৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫)। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গামে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কোনো শিল্পসৃষ্টি দেশকালের সীমার উর্ধ্বে নয়। কালোত্তীর্ণ হতে পারে যে রচনা, তাই চিরন্তনের মর্যাদা পায়।

'নবান্ন' যে দেশকালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সেটি ছিল বড় দুর্যোগের, এক ক্রান্তিকালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯ -এ। ভারতের বিদেশী শাসক রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। একদিকে হিটলারের

জার্মানি, মুসোলিনীর ইটালী, ফ্রাঙ্কের স্পেন, তোজোর জাপান ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ট শক্তি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তার দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ওদিকে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবী ব্যাপী সংগঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে রমাঁ রলাঁ, গোর্কি, রাসেল, শ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে, পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কোলকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় কমিটি। এই রাজনৈতিক বাতাবরণে ১৯৪৪ -এ বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের প্রকাশ নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। নাটকটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গামে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৪ নাট্য পরিচালক ঃ বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুনাথ মিত্র। শ্রীরঙ্গামে সাতবার অভিনয়ের পর ,শিয়ালদা রেলওয়ে ম্যানসন, শ্রী ও কালিকা থিয়েটার, প্রত্যেকটিতে সাতদিন করে নবান্নের অভিনয় হয়। এই নাটকের মধ্যেদিয়ে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষের জীবন, লড়াই, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল দর্শক সমাজ মতুন করে বাঁচবার একটি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকের পটভূমিকায় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। সে পরিচয় প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী-পুত্রের আত্মবিসর্জনের ঘটনায় প্রতিফলিত। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যে সামাজিক- প্রাকৃতিক ঘটনা এ নাটকে ফুটে উঠেছে তা হল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণিত হল—বাংলা সন১৩৫০-এর মন্বন্তর। আর এই মন্বন্তর গ্রাম গঞ্জের চাষী-ক্ষেতমজুরকে ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে নিয়ে এসেছে শহরের ফুটপাতে, লঙ্গারখানায়। ক্ষুধার জ্বালাতেই প্রধান দোরে দোরে ঘোরে দু-মুঠো ভাতের জন্য, কুঞ্জ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে করতে গিয়ে কুকুরের সঙ্গো লড়াই করে। ওদিকে মন্বন্তরের সুযোগ নিয়ে কালীধন অতিরিক্ত মুনাফার জন্য চাল গুদামজাত করে কালোবাজারী করে। সেবাশ্রমের আড়ালে নারী দেহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। হারু দত্ত নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে শোষন করতে দ্বিধা করেনা। অবশ্যম্ভাবীরুপে দেখা গেল, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। দেশকালের এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলা যখন শ্মশানভূমিতে পরিণত, সেই সর্বস্ব হারানো গ্রামের বাস্তব চিত্র এই 'নবান্ন'।

'নবান্ন' নাটকের তাৎপর্য :

সমাপ্তি দৃশ্যের অভ্যন্তরে নিহিত আছে 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য। নবান্ন শব্দটির অর্থ হল নতুন অন্ন। নবান্ন শব্দটি ভাঙলে তাই দাঁড়ায়। নব অন্ন—নবান্ন। নতুন অন্ন এখানে বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। নবান্ন হল নতুন চালের পায়সান্ন। গ্রাম বাংলার কৃষকের নতুন ধান কেটে ঘরে তুলে সেই নতুন ধানের নতুন চালে পায়সান্ন তৈরি করতো। শুধু পায়সান্নই নয় পিঠেপুলিও হত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে তা আনন্দের সঙ্গো খেত। সমস্ত গ্রাম বাংলায় এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসব। এই নির্দিষ্ট দিনটিতে খেলাধূলো, এবং

প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মানুষ সমবেত হয়ে সেই অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা দেখতো এবং উপভোগ করতো। অবিভক্ত গ্রাম বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এই নবান্ন উৎসবে আড়ম্বর ছিল সর্বাধিক। গ্রামের বৌ-ঝিদের এই উৎসবে ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই উৎসবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অধুনা, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম্য সংস্কৃতির মতো নবান্ন উৎসবও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো দুই বাংলার গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে এই দিনটিতে প্রবেশ করলে নবান্ন উৎসবে গান বাজনার ভগ্নবিশিষ্টের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখনো মাঝবেলায় কোনো কোনো গ্রাম্যবধূ নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র দেহ মন নিয়ে নবান্ন রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। এখনো কোনো বাড়ির আনাচে কানাচে নাক রাখলে রুপশাল অথবা কামিনীর নবান্নের সুবাস এসে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। কোথাও কোথাও গৃহ বধূর আলতা পরা পায়ের আঘাত পড়ে ঢেঁকির পাড়ে, চাল সেই আঘাতে গুঁড়ো হয়ে পিঠে পুলির উপকরণে পরিণত হতে দেখাযায়। অবশ্য এটি অতি বিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে এটি অতিবিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে যন্ত্র। সভ্যতা সমাজকে এগিয়ে এনেছে ঠিক , কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব গুলো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে। আজ গ্রাম্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে প্রায় বিলীন।

'নবান্ন' নাটক আমাদের মনে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনে নবান্ন উৎসবের ছবি । বন্যা, মহাযুদ্ধ-মহামারী আমিনপুরের গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধ দিন যাপন পদ্ধতির বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। মানুষ হয়েপড়েছিল জন্তুপ্রায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মান-সম্ভ্রমহীন ভিখিরীতে রুপান্তরিত হয়ে মানুষ ভুলতে বসেছিল আপন অস্তিত্ব। এই রকম এক ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ পূর্ণ দিনে যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্নটা ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সেখানে নবান্নের উৎসবের কথা ভাবাই যায়না। কিন্তু এত ঝড় ঝাপটায় সেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার স্মৃতিকে। তাই যখন আবার ঘরছাড়া মানুষগুলো ফিরে এসেছে গ্রামে, নতুন ধান তুলেছে ঘরে , তখন নবান্ন উৎসবের কথা জেগে উঠেছে । নবান্ন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তারা। তাই বিগত দিনগুলোর বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে আয়োজন করেছে নবান্ন উৎসবের। এই নবান্ন উৎসব শুধুমাত্র উৎসব নয় ,এর ভেতর একটা মিলনের ইঙ্গিত আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, এই উৎসব প্রত্যেক বাড়িতে হত, তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে অংশগ্রহন করতো। তারপর সমবেত হত কোনো প্রান্তরে, গ্রাম্য সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করত সেই আনন্দ। 'নবান্ন' নাটকের শেষে আমরা দেখি সেই রকম এক পরিবেশ। নবান্নের উৎসবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যে হিন্দু মুসলমান অতীতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে একে অপরকে সন্দেহ করেছে, সেই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে নবান্ন উৎসবের চাঁদোয়ার নিচে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন,একটা বিরাট ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে যাঁরা পারস্পরিক হনন লিস্পায় মেতে ওঠে তাঁরাই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দিশার প্রীতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু কালোরাত্রির মতো সেই ভ্রান্তিটা একদিন কেটে গিয়ে আবার রচিত হয় মিলনের ক্ষেত্র। নবান্ন উৎসব প্রাঙ্গনে তাই দেখা গেল হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জড় হয়েছে। শুধু

জড় নয়, এই উৎসব ক্ষেত্র থেকে সকলে শপথ গ্রহন করছে আকালের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধের । সুতরাং 'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এদিক থেকে যথেষ্ট। নবান্ন উৎসব 'নবান্ন' নাটকে শুধু উৎসব থাকেনি, হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণনাটকের যেটি উৎসব প্রধান উদ্দেশ্য—চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এক আদর্শের পতাকাতলে এনে ফেলা,— নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের শেষ দৃশ্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যকার তার চরিত্রগুলোকে বহু ঝড় ঝাপটা বহু বিসর্পিল পথ ঘুরিয়ে পুনরায় অতি পরিচিত নবান্ন উৎসবের অনাবিল আনন্দের মধ্যে এনে জীবনের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিতের দ্যোতনা করেছেন।

৮৭.৪ মূলপাঠ ২ : নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

'নবান্ন' চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ। দ্বিতীয়ে পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে দুই ও তিনটি দৃশ্য আছে । অর্থাৎ মোট পনেরোটি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গ্রাম ও শহর জীবনের শঙ্কা ও সঙ্কটের চিত্র তুলে ধরে সমস্যার একটি ইতিহাচক সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

রাতের অন্ধ্রকারে মালভূমির মত উঁচু জায়গায় কতকগুলি ছায়ামূর্তির আনাগোনা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের সূচনা। পটভূমিতে আগুনের আভা, বাইরে বাঁশের গাঁট ফাটার মধ্য দিয়ে মেসিনগানের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে বেশ একটি সন্ত্রস্ত ভাব। আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে গাঁয়ের মধ্যে একটি সদা সন্ত্রস্তভাব বিরাজ করছে। বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার আগষ্ট আন্দোলনের কর্মী তাঁর দুই ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছে। তার স্ত্রী পঞ্চাননীও মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে দেখে এবং স্বদেশের টানে নিজে আন্দোলনে যোগ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। পথেই পুলিশের গুলিতে সে মৃত্যু বরণ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ,প্রধান, নিরঞ্জনের সঙ্গে রাধিকা,বিনোদিনীর পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের দিনে অভাবী সংসারের সরল মানুষগুলির পারস্পরিক কলহ উত্তাপের ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের ভার বহনে যখন পুরুষরা অসহায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে তখন নারীদের অসহায়তা ও সেইসঙ্গে অসহিষ্ণুতা বোধ আরও বেশি হবে ,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এর পরিচয় পাওয়া যায় কুঞ্জ রাধিকা ও নিরঞ্জন-বিনোদিনীর কথোপকথনে।

তৃতীয় দৃশ্যে সংকটের আরও ঘনীভূত রুপ দেখা যায় প্রধানের জমি বিক্রি করবার উদ্যোগের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত মানুষের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়, হারাধনের মত পোদ্দাররা। অপর কৃষক দয়াল এ-ভাবেই সব হারিয়েছে, এমন কি বীজধান পর্যন্ত। অবশেষে তাকে প্রতিবেশী সমাদ্দার বাড়ি চালের সন্ধানে যেতে হয়েছে। স্ত্রী রাঙার মা "ধুঁকছে কাল বিকেল থেকে"। এই দৃশ্যেরই শেষে আকস্মিকভাবে ঝড় ওঠে, সাইক্লোনে প্রধানের দোচালা বিনোদিনীর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে—সে অচৈতন্য হয়ে যায়। ওদিকে বন্যায় সব ভেসে যায়। দয়াল বাড়ি গিয়ে দেখে রাঙা, রাঙার মা বন্যায় ভেসে গেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে এরই পরিণতিতে ভয়াবহ অভাব ও অন্নসংকট। "নিত্যি ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল"— এর বিরুদ্ধে কুঞ্জের ছেলে মাখন বিদ্রোহ করে।*

পঞ্চম দৃশ্যে ওদিকে হারু দত্তের লোভ প্রধানের জমির জন্য। প্রধান সব বোঝে। তার সঙ্গে জমি বিক্রি নিয়ে কথা হয়। প্রধান রাজি না হওয়ায় সে নতুন ভাবে চাপ দেয়। কুঞ্জ উপলব্ধি করে "টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দাও।" হারুর লোকজন কুঞ্জ ও প্রধানকে মারে। মাখন এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু সমস্ত পরিবারকে বিচলিত করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু শহরে। কোলকাতার চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে মজুরের কাজ করে। হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল ও মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে কালীধনকে সরবরাহ করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মজুরদারী ও কালোবাজারী যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় যে জেঁকে বসেছে তার ছায়া এই দুটি চরিত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এরা বিবেকহীন ও হৃদয়হীন ও অমানবিক বাণিজ্যিকতার জাল সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত করে রাখে—সে পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ভাবে চড়া দামে চাল বিক্রির প্রতিবাদ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বশংবদ কর্মচারী ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে "কত জন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখবার পারে তা নি জানো।" এদেরই চক্রান্তে ও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষণায় 'মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষ' লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

অপর দৃশ্যে দেখা যায় সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের পার্কে আশ্রয় নিয়েছে দুমুঠো খাবার আশায়। এরই মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুযোগ সন্ধানীরা নানা রুপে ও বেশে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রহীন এই নিরন্ন কঙ্কালসার মানুষগুলোকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। এদের কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা টাউট। প্রথমোক্তরা প্রধানের ভাষায় 'কঙ্কালের ছবির ব্যবসাদার,' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা রাজপথের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমোক্ত জন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছে না, আর অপরজন ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই করছে। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। ওদিকে বড়লোকের বাড়ি পানভোজনের সমারোহ, কিন্তু সামান্য উদ্বৃত্তটুকুও দুর্গত মানুষের কল্যাণে দিতে এদের হাত ,সরেনা। ওদিকে দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হারু একদিকে বিপন্ন মানুষের জমি বাড়ি সস্তায় কিনে নেয়, অপরদিকে গ্রামের দুঃস্থ মা-বাপকে ভুল বুঝিয়ে মেয়ে কেনে, শহরে চালান দেয়। কালীধনের সেবাশ্রম সেবা-নামের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কালীধনের দোকানে দারোগা পুলিশের আবির্ভাব—চালক্রেতা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে এসেছেন। নিরঞ্জন ইতোমধ্যে সেবাশ্রমে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। নিরঞ্জন চালের গুদাম ও সেবাশ্রমের ব্যবসার সব পরিচয় তুলে ধরলে পুলিশ ওদের হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টিতে এমন একটি ভাব ধরা পড়ে যে তাদের ছাড়া পেতেও অসুবিধে হবে না।

---

*"About 50 per cent of the people are dying from starvation at present and about 40 per cent are living in semi-starvation, subsisting on herbs vegetables, and other inedible and undigestable food. People are also dying of cholera." (Quoted from 'Biplabi,' July 29, 1943–a weekly published from underground in and around Tamluk–Sutahata, Midnapur. Edited and Compiled by B.Chakraborty).

তৃতীয় অঙ্ক সংক্ষিপ্ত—দুটি দৃশ্য, একটি লঙ্গারখানার, অপরটি চিকিৎসা কেন্দ্রের। প্রথমটিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। এরই মধ্যে উপস্থিত কুঞ্জ রাধিকা ও অন্যান্য গ্রামের মানুষ। এদের কথাবার্তায় প্লাবনশেষে ফসলের প্রাচর্যের নানা গল্পকথা। একজন বৃদ্ধ ভিখারী শহর জীবনের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে বলে। কুঞ্জ রাধিকাও পোড়ামাটির শহর ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। আর দ্বিতীয় দৃশ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রধানকে দেখা যায়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন সাধারণ চিকিৎসারও আয়োজন নেই, চিকিৎসার নামে একরকম প্রহসন চলছে। এখানে প্রধানকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যায়। দৃশ্যের শেষে বলা তার কথাটি "ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য, প্রথমটি বেশ বড়। ঘটনাস্থল আমিনপুর। শহর থেকে ঘরে ফিরে আসা মানুষরা নিজ নিজ বাড়িতে উপস্থিত। নিরঞ্জনের উদ্যোগে, দয়ালের পরামর্শে প্রধানের বাড়িতে সকলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের সম্ভাব্য সঙ্কট উত্তরণের জন্য পরামর্শে নিযুক্ত। নানা ধরনের কথাবার্তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে খাটার সঙ্কল্পে নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর মিলনের সুখময় পরিবেশ—ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের আবেগময় দৃশ্য রচনা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই সম্প্রসারিত রুপ—খেটে ফসল তুলে, ঝাড়াই-এর পর ধর্ম গোলায় কুঞ্জ হিসেবের বেশি ধান প্রথম জমা দেয়। ঠিক করে এবার নবান্ন উৎসব ধুমধাম করে করা হবে। সমাদ্দার পরিবারের বারবার মনে পড়ে প্রধানের কথা।

শেষ দৃশ্যে 'নবান্ন' এর উৎসব চলছে। গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকাল সমবেত হয়েছে। চলছে কৃষক রমণীর গান নাচ আর মোরগের লড়াই, গরুর দৌড়—জয় হল ফেকু মিঞার মোরগের আর রহমত উল্লার গরুর। অকস্মাৎ এই আনন্দোৎসবে প্রধানের আবির্ভাব। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সব বুঝতে পারে। সকলে মিলে জোর প্রতিরোধের সঙ্কল্প নেয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৮৭.৫ সারাংশ

'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'নবান্ন প্রকাশের পর ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। (১৯৩৯-৪৫)। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এসময়ের মধ্যে আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী কারান্তরালে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে সমস্ত দেশব্যাপী বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে শাসক ইংরেজদের সীমাহীন পীড়ন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে দেশের ভিতর 'পোড়ামাটি নীতি' ঘোষিত হয়েছে। এই ৪২ আক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশ সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেশবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর। বাঙলাদেশের ১৫ লক্ষ মানুষ এসময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। জোতদার-মজুতদার এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার শোষণ করে; 'নবান্ন' সমাজের সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

'নবান্ন' এর বিষয়বস্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক জীবনের কথাই এর মূল প্রতিপাদ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় জোতদার-মজুতদারের ভয়ঙ্করতম শোষণ ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সব মিলিয়ে একটা সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ এ নাটকের

প্রেক্ষাপট।

এদিক থেকে 'নবান্ন'-এর বিষয়বস্তু অভিনব। মন্বন্তর তো শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মারী-হাহাকার তার নিত্যসঙ্গী। এই দুঃখ দুর্দশায় আমিনপুরের সমাদ্দার পরিবার তথা বাংলার বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষক পরিবার প্রাণধারণের প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে শহর কোলকাতার রুক্ষ পাষাণ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে। নাটকে তাদেরই জীবনবৃত্ত রুপায়িত হয়েছে। শহরের সম্পন্ন গৃহস্থ এই দুঃস্থ মানুষগুলির প্রতি যে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে, তা উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতার পরিচয় দেয়। এর প্রতিকার কামনায় বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গাঁতায় চাষ ও ধর্মগোলার ব্যবস্থা করেছে। তারা জোটবদ্ধতার শপথ নেয়। এভাবেই নবান্ন হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।

৮৭.৬ অনুশীলনী ১

১। 'নবান্ন' নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে অন্তত দুটি উদাহরণ দিন।

২। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখুন।

৩। বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক ও তার নাট্যকারের নাম লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫।'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৭.৭ মূলপাঠ ৩ : 'নবান্ন' নাটকের প্রাসঙ্গিত আলোচনা

'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আগস্ট আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমনপীড়নের বর্ণনা। এই সময় প্রধান হারাল তার সংগঠক স্ত্রী পঞ্চাননীকে। বন্যায় এবং হারু দত্তের অত্যাচারে হারাল নাতি মাখন এবং আমিনপুরকে। সমস্ত ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পার্কে ভিখারীর জীবন যাপন করতে থাকল। এখান থেকেই বিনোদিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মূল দল থেকে। তারপর সরে গেল কুঞ্জ, রাধিকা; সকলকে হারিয়ে শহরের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে প্রধানের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটল গ্রামে। এটাই নবান্ন নাটকের মূল ধারা। কিন্তু এই মূল ঘটনাবলী বর্তুল-আকারে ও প্রায় সংঘাতবিহীন ভাবে ঘটেছে। এর মধ্যে কারুণ্য থাকলেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই এমনকি বৈচিত্র্য নেই বললেও চলে। অথচ মূল ধারা থেকে প্রথম যে শাখাটি বেরিয়ে এসেছে—বিনোদিনী যে অংশের প্রধান—স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে (মিলনটা অতর্কিত) যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেটা কিছুটা চমকপ্রদ। হারু দত্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অত্যাচারী, তার অত্যাচারে প্রধান পরিবার গৃহহারা, দেশছাড়া। ধান চালের চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর অসৎ চরিত্র, মেয়ে পাচারকারী, এক কথায় ভিলেন বা খল চরিত্র। কালীধন চালের ব্যবসাদার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ও যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফার ফাঁপানো ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সেবাশ্রমের ব্যবসাকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছে। এরা সবাই মুনাফা লুটছে, রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ফুলে, ফেঁপে একশা হয়ে গেছে। নাটকটি যদি

এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাটক হত তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটত। কেন না, এই অঙ্কের শেষে হারু দত্ত কালীধন স্বরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। বিনোদিনী নিরঞ্জনের সক্রিয় চেষ্টায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হারু দত্ত যে অত্যাচার চালিয়ে দর্শকমনে উষ্মার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে তাদের হাতে হাতকড়ি পরাতে পেরে নিরঞ্জন বিনোদিনী খুব তৃপ্তি পেয়েছে, সেই সঙ্গে দর্শকও খুশি হয়েছে এবং নিরঞ্জন বিনোদিনীর আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যাচারিত হয়েছে যারা, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা সেই কুঞ্জ রাধিকা, প্রধান এ সবের বাইরে থাকল। তারা এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না। তার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা গুরুত্ব হারিয়ে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল মাত্র। সাধারণত, প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটকে ঘটনাক্রম অগ্রবর্তী হয় এই রকমভাবে—অত্যাচারীর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তারপর তাকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উদ্বোধিত শক্তির আঘাতে অত্যাচারীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর আর নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। নাটকের গঠনশৈলী তাহলে শিথিল হয়ে পড়বে। ঘনসন্নিবদ্ধ রূপটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 'নবান্ন' নাটক তারপরও এগিয়েছে এবং জনচিত্তে আলোড়ন তুলে জমজমাটি রূপটা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন— 'নবান্ন' এর আগে আমাদের সব ট্রাজেডিই ডোমেস্টিক ট্রাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। এ নাটকে প্রধানের সংসার সেন্ট্রাল নয়। এর মধ্যে ছিল পোয়েট্রি অব মোমেন্টস। আমরা দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য জুড়েছিলাম ওয়েলিং দিয়ে। হার্ট-রেনডিং 'ফ্যান দাও চিৎকার দিয়ে। র' রুডনেস থেকে পোয়েট্রি উঠে আসত। একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইলডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে : জল খাবে? তেষ্টা পেয়েছে? মহর্ষি এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'এটা শাশ্বত'।

আর এক জায়গায় বলেছেন—নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেকটার আছে। সম্পাদনায় একটু গোছানো হলেও, একটু সংহত হলেও সে কারেকটার বজায় রাখা ছিল। সম্পাদনায় দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে এক একটি এপিসোডের এক একটি ক্লাইম্যাকস প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আসে। প্রযোজনায় এই ক্লাইম্যাকসকে তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে দুই দৃশ্যের মাঝখানে 'ফ্যান দাও', 'একটু ফ্যান দাও' এই আর্ত কোরাস নেপথ্যে শোনা যেত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পথেঘাটে এই আর্ত চীৎকার ভীষণভাবে শোনা যেত। দর্শকের কানে এটা টাটকা ছিল, দারুণ জীবন্ত ছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর 'নবান্ন' নাটক ক্রমঅগ্রবর্তী হওয়ার পক্ষে শ্রীশম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর বক্তব্যে প্রয়োগচাতুর্যের দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। আমরা তাঁর বক্তব্য স্মরণে রেখে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাবলীকে একটু বিশ্লেষণ করে অন্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

নাট্যকার হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে প্রত্যক্ষত জনশত্রু হিসেবে ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বড় করে দেখাতে চাননি, মানে একমাত্র নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে দেখিয়ে তাদের ধ্বংস করাটাই বড় কাজ

বলে মনে করেননি। তিনি এদেরকে একটি ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সামান্য শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়োজিত করে পরাজিত করতে চেয়েছেন। ঘটনাটা যেমন ভাবে ঘটেছে তাতে এরকমটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কিন্তু তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ কে? নাটক মানেই সংঘাত। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংঘাতের ক্ষেত্র রচিত হয়। আর তার ফলে নাটকে এসে পড়ে একটি অনিবার্য গতিবেগ, তরতর করে নাটক ছুটে চলে। কিন্তু কালীধন, হারুদত্তের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষের পতনের পর নাট্যকার কাকে প্রতিপক্ষ করে পরবর্তী দুটি অঙ্ক পর্যন্ত নাটকে টেনে নিয়ে গেলেন—এ প্রশ্ন স্বভাবত না জেগে পারে না। নাট্যকার পৌঁছতে চান নবান্নের উৎসব দিনে, যে দিনটিতে সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং সকলের মিলনে উৎসব হয়ে উঠবে প্রাণ অপূর্ব রসে সঞ্জীবিত। এই উৎসব মুখর দিনে সকলে শপথ নেবে প্রতিরোধের, আকালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শপথ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ কালীধন হারু দত্ত নয়, প্রধান প্রতিপক্ষ আকাল। এখন এই আকাল ব্যাপারটি কি একটু জানা দরকার। আকাল -এর আভিধানিক অর্থ দুঃসময়। যা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় 'নবান্ন' রচনাকালে চলছিল এক চরম সঙ্কট। একদল মানুষের অর্থগৃধ্নুতা, শক্তির দম্ভ এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অশুভ বাসনা টেনে এনেছিল যে বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে বিশ্বের কতিপয় দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট। জনজীবন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রামের সুস্নিগ্ধ জীবন প্রবাহে ঘটে গিয়েছিল অবাঞ্ছিত ছন্দপতন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় সমাজব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলা করে তোলবার জন্য শোষক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধির ফলে এসে গেল আন্দোলন। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়— তার ফলে দেশে দেখা দিল ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যার দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে পড়ল একান্ত অসহায়। মানুষের খাদ্যশস্য রাতের অন্ধকারে চলে যেতে লাগল ব্যবসায়ীর গুদামে। কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর ও দীর্ঘতর করে তোলবার প্রয়াস পেলেন অসাধু ব্যক্তিবর্গ, তারা খাদ্যশস্যের অহেতুক অপচয় ঘটাতে লাগলেন নানা উপায়ে। এমন কি বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার খবরও পাওয়া যেতে লাগল। এ সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা। সব মিলিয়ে দেখা গেল দেশের বুকে একটা চরম দুঃসময় বিরাজমান অর্থাৎ আকাল এসে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিতে লাগল। নাট্যকার সেই বিষয়গুলিকে একে একে তুলে ধরেছেন নাট্যাঙ্গিকে। এবং উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্মিলিত দুশ্চেষ্টায় জনজীবনে এসে পড়া আকালকে প্রতিপক্ষ করে তার বিরুদ্ধে প্রতি রোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার। এই যে বিরাট শত্রু বা দৃশ্য নয় অথচ যার জঘন্য আত্মপ্রকাশ ঘটছে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবার জন্য, মানুষের সংসারের শান্তি, জীবনের সুখকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যে শত্রু প্রত্যক্ষ এবং নাগালের মধ্যে তাকে শায়েস্তা করা যায় সহজে। তাই কালীধন, হারু দত্তেরা অতি সহজে ধরা পড়ে। তারা এতো সহজে এবং এতো সত্বর ধরা পড়ায় অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করবার ব্যবস্থা করে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু যে শত্রু অপ্রত্যক্ষে থেকে সমাজের ক্ষতি করে যায়, প্রথমে তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে। তাই এই আকালে সর্বস্ব হারিয়ে এই গ্রাম্য

জনতা এটুকু বুঝেছে যে আর একটা আকালের প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার দরকার আছে। তাই নাট্যকার একে একে আকাল সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির স্বরুপ উদঘাটন করে গেছেন প্রথম পর্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের চরিত্র, তিনি দেখিয়েছেন বস্ত্রহীন, শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো পরিহিত ক্ষুধার্ত নগ্ন নরনারীর ছবি তুলে একদল অসৎ সংবাদজীবী এবং ফটোগ্রাফাররা পয়সার লোভে বিদেশের খবরের কাগজে তা বিক্রি করেছে, বিনিময়ে আর্ত জনতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে দু-চার আনা পয়সা। নাট্যকার দেখিয়েছেন, যে যুদ্ধের ব্যাপক জনতার কোনো সম্পর্ক নেই সেই যুদ্ধ কার মঙ্গালের জন্য? যুদ্ধ কিসের জন্য এ বোধ যাদের নেই সেই সব মানুষদের ধরে ধরে যুদ্ধে সাপ্লাই করছে একদল অর্থলোভী কন্ট্রাকটর। তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের লালসা মেটাবার জন্য অসহায় ফুটপাত বাসী সোমত্থ নারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের বুক খালি করে। তিনি দেখিয়েছেন হাসপাতালের শোচনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। সব মিলিয়ে দেশের একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এসব দেখাবার উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করে তোলা। শুধু সচেতন নয় একটা প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলবার পজিটিভ ইঙ্গিতেও তিনি রেখেছেন তার নাটকে। আগামী দিনে আবার যদি আকাল আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নাট্যকার সে কথা ব্যক্ত করেছেন দয়ালের মুখ দিয়ে, 'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, সে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন ; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ!—এ প্রতিরোধ আকালের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ মূলক নাটকে তাই স্থান কাল পাত্রের সুসঙ্গতি, ঘটনার যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস, ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েন এবং তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব সব সময় সঠিকভাবে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যায়না। 'নবান্ন' নাটকে সে হিসেবে গঠনগত দিক থেকে অল্পস্বল্প ত্রুটি থেকে গেছে। নাট্য সমালোচকের চোখে সে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা সহজেই পড়ে যাবে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য রকম ভাবে। গতানুগতিক নাটক আর গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য গণমঞ্চের নাটকের একটা স্পষ্টরেখ পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যসূত্রে নাটকে একটা বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এসে পড়েই এবং আকস্মিকতার একটা সঙ্গতিবিহীন চমক না থেকে যায়না। এ গুলিকে সমালোচনার খাতিরে শৈল্পিক ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন দৃশ্য পারস্পর্যবিহীন এক একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। এই সব চিত্রগুলি যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হত তাহলে খুব ভাল হতো। নাটকের ঘটনাবলী একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে পরিণতি প্রাপ্ত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পূর্বের কথার জের টেনেও বলতে পারি গণনাটকের বিচার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই করতে হয়। প্রসঙ্গাক্রমে 'নীলদর্পণ'-এর কথাটা এসে পড়ে, আর নীলদর্পণে একটা প্রচারের দিক থাকা সত্ত্বেও নাটকটি অনেক বেশি নাট্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভাববার দরকার আছে। কেন না, 'নীলদর্পণ' প্রথমত গণনাটক নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কথাই এই নাটকের একমাত্র বক্তব্য বটে তবে তারাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তা

যদি হত নবীন মাধব নায়ক আর তার পরিবারের বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি এটা হতে পারত না। শিথিল অর্থে নাটকের মধ্যে যেটুকু ট্রজেডির চেহারা দেখা গেছে, তা গোলোক বসুর পরিবারের ট্রজেডি হয়ে গেছে। সমস্ত কৃষক পরিবারের ট্রজেডি হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে প্রশ্ন, 'নবান্ন' নাটকে কি সেই ট্রাজেডির কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? বিষয়টা একটু ভেবে দেখে যেতে পারে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এই নাটকের কেন্দ্রীয় পরিবার। এই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বেশি। নাটকে দৃশ্যত উদ্বাস্তু হয়েছে এই পরিবারটিই, এই গ্রাম্য পরিবারটির একটা বিপ্লবাত্বক ভূমিকাও আছে। প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ আর প্রধানের সংলাপ ,পরে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, আর তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই পরিবারের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এই পরিবারটিই ভিখিরিতে পরিণত হল, এবং সমাপ্তি পর্বে আবার মিলনের বিন্দুতে সংস্থিত হল, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সমাদ্দার পরিবারটিই 'নবান্ন' নাটকের একটা ট্রাজিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। আবার প্রধান সমাদ্দারের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ভাববার একটুখানি সুযোগ থেকে যায় যে ব্যক্তি ট্রাজেডির একটি বুদবুদ। কিন্তু ব্যক্তির ট্র্যজেডি হতে গেলে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে যে দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড় করান দরকার নাট্যকার তা করতে পারেননি। অপরপক্ষে চরিত্রটি গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষাদের ঘণীভূত রুপটা তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে দর্শকমনে একযোগে ভয় ও করুণা জাগেনা। বরং পাগলামোর একটা হালকা আবরণ জড়িয়ে এবং কখনো কখনো আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট করে চরিত্রটা তরল করে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অসংগত অবাস্তব পাগলামো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও প্রধান অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের অতিনাটকীয় ভূমিকার শিকার। অনেকদিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও আসল কথা এই যে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান পরিবার বা প্রধান চরিত্রটি সেন্ট্রাল নয়। গোটা সমাজের ছবিটা ফুটিয়ে তোলাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ডোমেস্টিক বা পারিবারিক ট্রজেডি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নাট্যকারের এখানে ছিলনা। আগষ্ট আন্দোলন বন্যা-বিশ্বযুদ্ধ— এই তিন বস্তুর সমবায়ে আগত আকালের কবলিত হয়ে কৃষক সাধারণের জীবনে যে ছন্দপতন ঘটে গেছে, যে ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে তাতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে গোটা সমাজের চেহারাটা দিয়েছে বদলিয়ে কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ পরিবার নয়, সমস্ত কৃষক সমাজ সমস্ত গ্রাম্যজনতার জীবন দুঃখ, দুর্দশা হাহাকারে ভরে গেছে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার বা তার পরিবারটাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের পথে ছেঁড়া কাপড় আর একপেট বুভুক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। সমস্ত কৃষক সমজই হয়েছে ক্ষতিগ্রত, তাই এই সব দিকে তাকিয়ে ব্যাপক অর্থে আমরা 'নবান্ন' নাটককে সামাজিক ট্রাজিডি মনে করতে পারি। তবে প্রসঙ্গাক্রমে বলে রাখা ভাল যে সঠিক অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক বাংলায় বিরল। না থাকবার কারণটাও অবিদিত নয়। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থায় ট্রাজেডি হতে পারেনা। আবার ব্যক্তির ট্রাজেডির জন্য যে ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের দরকার তেমন পুরুষ বিরল। এসব দিক বিচার করলে বলা যায় 'নবান্ন' নাটক ট্রাজেডির নাটক নয়। 'নবান্ন' ছোট ছোট ঘটনার, ছোট ছোট চিত্রের নাটক। 'নবান্ন' প্রতিবার প্রতিরোধের নাটক।

এই নাটক সম্পর্কে আরো একটু বলবার কথা এই যে, নাটকীয় চমক সৃষ্টির দিকে নাট্যকার অতিরিক্ত

মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বক্তব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার কথা সেটি থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা সৃষ্টির পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৮৭.৮ মূলপাঠ ৪ : 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থিবদ্ধ হত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয়বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অঙ্কিত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রুপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তিরই হোক বা মনস্তত্ত্বেরই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্থলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হচ্ছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

'নবান্ন' নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। 'নবান্ন' প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রুপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। 'নবান্ন' নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্বাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইচ্ছাটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'নবান্ন' নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন আর তার ফলস্বরুপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সঙ্গে মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সঙ্গে অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা; ঘর বাড়ি মানুষজন জীব জন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। .....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা! তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্ত ও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে। দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সঙ্কটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল

আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়! তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে দুর্ভিক্ষের বাজারে। 'এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করেছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।'[হারু দত্ত : ১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সঙ্গে শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দলবল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল 'একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া'।

'নবান্ন' নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্ত যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সঙ্গে। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। 'সেবাশ্রম' নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এইরকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্ত গুপ্ত বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্ত শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ

ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কন করা আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সঙ্গে কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সঙ্গে ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লঙ্গরখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথাবার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এর পরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণাবশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, 'নবান্ন' নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সঙ্গে আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কেও পাঁচটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি এবং চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অঙ্কে মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন 'নবান্ন' এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৮৭.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে 'নবান্ন' রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকে 'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন—এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয়বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেষে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাধারণত পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবির্বতনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত (crisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফি/ডেনোমেন্ট—পূর্ণাঙ্গ বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্ধেন্দু-দানীবাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবর্তীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক

নাটক ক্রমশ তিন অঙ্ক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গরখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক (এপিক) ব্যাপ্তি এপিসোডিক ক্যারেকটার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৮৭.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

(ক) প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

—বক্তা কেনে পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? 'অন্নকূট' শব্দটির বাচ্যার্থ

ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

(খ) "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।" —বক্ত কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" —বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

(ঘ) "আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"—বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলঙ্ক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা স্থির করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৮৭.১১ মূলপাঠ ৫ ঃ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম :

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত

ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভু হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেইরকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রুপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যাবৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট ও ব্যপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও

চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রুপায়িত হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অঙ্কিত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অর্ন্তদ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অঙ্কন করেছে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথাবার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথাবার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে 'শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।' পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এবম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, 'চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।' কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পরিবর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তুপীকৃত

বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরিবর্তে আত্মরক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত তাহলেও চরিত্রটা সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরিবর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্যবশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকী কান্না! আমার সহানুভুতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই! তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল! কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির তলদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরিবর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্থায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উচ্চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউণ্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্থা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উষ্ম আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাসবাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদীপ্ত হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান

এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের; তা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] এই বক্তব্য কুঞ্জর পলায়নবাদিতার দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,.....'জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খচ্চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ইজ্জৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তিসম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ইজ্জতের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধুর্তুমি। তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অযুত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি

এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস বুঝি?.....বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালাগাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!' (১/২) কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গো দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গো অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রূঢ়। কিন্তু রূঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুক্ত পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি। প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' (১/৩)কুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (১/৩) মুখে উচ্চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'(১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গো তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গো হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে

দুরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার—যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে। গভীর প্রেমে, 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।' ফুটপাতের ওপর তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের বাস্তুভিটা আমিনপুরের স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে, 'হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না।' (৩/১) আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তর্স্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, 'গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?.....সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—'(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবুক আশা, 'আশা হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে।' কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়।

এক বাস্তব বোধসম্পন্ন দূরদর্শী মানুষের আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে কুঞ্জ গ্রামে ফেরে এবং ফিরে পায় তার পুরো সংসার। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চরিত্র নয়, আর নবান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউণ্ড চরিত্রের অধিকারী মানতেই হবে।

'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখ ভোগের দার্ঢ্য তার ছিলনা। দুঃখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে উপার্জনের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। তথাপি দুটি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং দুশ্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্ত অনুভব করেছে মারি মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চরিত্রটি পূর্বাপর পরম্পর্য সম্পন্ন ক্রমবিকাশমান চরিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টির এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছার দ্বারা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিংবা দুঃখ আর দুঃখ জয়ের কোনো বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার ; জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতঙ্গের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীপ্তির অপর্যাপ্ত শক্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অঙ্কনের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওইরকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালোবাজারী দুশ্চরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে

দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শক্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল, মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্ত গ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সে সবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধা!' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আচ্ছা করেঘা দু-চার —' (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে । 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে , তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন! —কী বল চন্দর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো!' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ..... তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। এবম্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো ।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

(২য় অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অঙ্গাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটাবুদ্ধির হয় , বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারতরক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সঙ্গে বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী। তার সঙ্গে বুদ্ধির কসরৎ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য হারু দত্ত অনেক কথা খরচ করে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথার কথা বলে ধরে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতুর নয়, কথার চাতুর্য তার তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃপ্ত নয়। নাট্যকার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দুটি চরিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য আর একটি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধরা পড়ে। চরিত্রটা খুব ছোট, স্বল্প পরিসরে আবর্তিত হয়ে টাইপ চরিত্রের 'ফরমুলাকে পালন করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রটার নাম রাজীব। রাজীব পূর্ববঙ্গাবাসী। নাটকের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলির টানে এই ছোট চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটা প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, 'রাধে গোবিন্দ বল মন।' অথচ এই গোবিন্দের জীবটি মানুষের ক্ষুধায় তীব্র ব্যঙ্গ করে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব। দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নের হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে সবাই, কালীধনের গদিতে সরকারের চাকরি করতে করতে তা তার জানা হয়ে গেছে। কালীধন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গারা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তীব্র সংশয় প্রকাশ করে সে, 'আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধার চাল না পেয়ে তারা যখন ক্ষিপ্ত স্বরে কথা হলে তখন সে কালীধনের হয়ে প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেদে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি।' (২/১) ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার শেষ সিদ্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব, মরার আইস্যা পরছে শহরে— কিংবা বিনোদিনীর সঙ্গে সেবাশ্রমে নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখে সবিস্ময়ে বলে , 'রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কইরা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড়!.....ভাবস বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না! (১/৫) তার ধারণা এবং বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা কালীধনের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার , এসবে আর কারো অধিকার নেই। তাই সে নিরঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহর মুখে খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ কী করে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক

আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!' আবার বিনোদিনী যখন ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আরে এইডা কী কর ! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে । বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভীতরে যাও।— কী আশ্চর্য!' (২/৫)

রাজীব বৃদ্ধ কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি সে। অন্ত্যন্ত করিৎকর্মা। কর্তার বিক্রম প্রকাশ করতে পঞ্চমুখ সে । নিজের প্রভূত্ব খাটাতে সে খুব তৎপর। কালীধনের সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড তার জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রী লোকেরা তাদের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন বরদাস্ত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বেরিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহরীর মতো বাধা দেয়। চরিত্রটির মধ্যে খুব গভীরভাব এবং ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপরিস্তরে ভাসন্ত এই চরিত্রটা নাট্যকার অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথাবার্তা, হালচাল, আদবকায়দার মধ্যেবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চরিত্রটিকে খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধ মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লজ্জা শরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? (১/১).....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ! !' (১/১০)— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অঙ্কিত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লজ্জাশীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শত মান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে

সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅঙ্কিত গ্রাম্যবধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলা; সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাতবাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সঙ্গে তীব্র সংগ্রামরত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া 'একেবারে কামড়ে খেলে গো'র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—'ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।'বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন 'ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।' ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তারচৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধি তা থেকেই বেরিয়ে আসে, 'খুব যন্তনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৮৭.১২ মূলপাঠ ৬ : 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্ত গঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের

অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে, তারপর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব- অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অঙ্গাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, 'চলে যাও' বললে একরকমের অঙ্গাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও' বললে অঙ্গাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, 'যাও, যাও চলে যাও' বললে তার অঙ্গাভিনয়টা হবে অন্যরকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'কৃষ্মকুমারী' নাটকে। কৃষ্ন কুমারিতে এসেছে কথ্যরীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত, প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপরীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। 'একেই কি বলে সভ্যাতা'র থেকে একটি উদাহরণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, 'কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গা— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য

মহাপ্রসাদ পাই—'

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রূপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরঙ্গায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে কাব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজার চলতি শব্দের ব্যবহার না থাকবার দরুন একটা মার্জিতরূপ গড়ে ওঠে। কবির মনোলোকের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দতরঙ্গ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জীবন প্রতিম বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন।' প্রসঙ্গাক্রমে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথবা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসঙ্গে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবির কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এবং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পারস্পররিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আমরা পার হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' (গিরিশচন্দ্র)

কিংবা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ— (অপরেশচন্দ্র)

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে। কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠবে। উঠুক! একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আর উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হবে যাবে। তার পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের ওপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ম সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অথবা, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্রম করে চল্লিশের দশক লিখছে, 'হেঃ, এ রক্তের আবার দাম! এ রক্তের জন্যে আবার মায়া! জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রুপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উষ্ণতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— 'ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি)—'

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!! (কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান)

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যাঃ!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মুমুক্ষু আত্মার মর্মবাণী, 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।'

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্ত্মে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বার বিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুদ্ধে চাষাড়ে রক্ত টগবগে হুংকার ছোড়ে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায়

এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে। আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে। মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাস বুননে—

(উন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ.....কুঞ্জ! .....কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরঙ্গ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনা! ' প্রস্থানরতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে

চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মণ্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উচ্চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নির্মলবাবু। স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুক্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যক্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '.....আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান :

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে

হয়েছে। এই সমস্ত উৎসবকালে গান-নির্ভর আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার জন্মসুত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌ রোৎসব থেকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ধরা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলার অঙ্কুর বলে মনে করা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন প্রধানত যাত্রা প্রভাবিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধারণের রসপিপাসু মন এর মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করত। এই ধরনের রচনায় ধর্মভাব ও সঙ্গীত বাহুল্য ছিল। এ দুটির উপস্থিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, মুক্তমঞ্চে, দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

ঊনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের প্লে-রাইট বলে চিহ্নিত করা যায় তারা জনচিত্তজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। ঊনিশ শতকের মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারেরা অনেকেই গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের গানের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম গানের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রুপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের বারটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা' দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরের গান 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এবং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদের গান 'নিস্‌লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাসলি।'

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'— কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের

নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায়বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সুখী তৃপ্ত গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভাবাতুর করে বইটি! কিন্তু দুঃখের দহন জ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলারব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নরঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটাবসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেলার আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাবরসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৮৭.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য

আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সঙ্কট, আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্মজ্বালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোক্তরা অসম শক্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।.....আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জঙ্গালে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্তান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ। প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শক্তিহীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে বলে, 'মাখন চলে গেলি'— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, '.....এ-এ চিনতে পারবেন!' কঙ্কালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, 'তা ভালো,..... কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! '— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পাচ্ছে না,

তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। .....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!' তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, 'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।' দয়াল যখন বলে, 'জোর প্রতিরোধ এবার,' প্রধানও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠে 'দয়াল'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে 'নবান্নে' কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা (sufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিক্ত করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে—এর চাইতে দুবির্ষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্য—ভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,—তার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সঙ্গে কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সঙ্কট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে

এসেছে। পশুর সঙ্গে খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরাব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে গিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষেগ্ন জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সঙ্গে নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারতরক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গালে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়—'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!!' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—এগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রামবধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গে দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে

নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধ্বস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃত—তা তার কথা থেকে বোঝা যায়—'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'—এভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শক/পাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বক্তব্য পস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাক রবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমন—

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? (১/১)

এই সংলাপ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহুবর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা। আবার—

পঞ্চাননী। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে (ক্ষীণকণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে

যা তোরা সব....

পঞ্চাননীর এই বাচিক ও আঙ্গিক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়—প্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সঙ্গে বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সঙ্গে যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' (কুঞ্জ ১/৫) অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' (কুঞ্জ ১/৫)—প্রথমটিতে বক্তার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোক্ত সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্থল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সঙ্গে বাংলা নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সঙ্গীত—কণ্ঠ ও বাদ্যযুক্ত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সঙ্গীত যদি নাট্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বমুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়—মুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছে—তাও নাটকের শেষে চতুর্থ অঙ্কের সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্দের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছে—'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে হব সোনা'। (৪/১) দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গান—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান/হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গান—'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৮৭.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন :**

(ক) 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা — ১০/১৮/২৪/৪৫

(খ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র — কুঞ্জ/প্রধান/নিরঞ্জন।

(গ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র — পঞ্চাননী/বিনোদনী/রাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**

রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। "তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।" —বক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৫। "চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।" —বক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার / হারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ 'অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক'—এ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। "এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।"—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়া মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। "তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।" —এই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। "ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল!" —কার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৮৭.১৫ মূলপাঠ ৭ ঃ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি এম. জড্রেল-এর লঘু নাটক 'দি ডিগসাইস্'-এর বঙ্গানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হল—তিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতো—তাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যাঙ্কনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সঙ্গে দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থিরচিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্ল্যাট সীন। কাঠের ফ্রেমের

ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সঙ্গে দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চে এলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রঙ্গমঞ্চে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"নলদময়ন্তী—Splendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।"

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য সজ্জায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যসজ্জায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চ এবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চে দুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। (১) পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। (২) উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অঙ্গ, আলোকসম্পাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হচ্ছে মঞ্চে নিশ্চয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে

দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসঙ্গে যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এইরকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চ পরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়—

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চ স্থাপত্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চ স্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে দেখাতেন, প্রাসাদ অঙ্গনে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি মঞ্চ পরিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটকটি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বঙ্গারঙ্গামঞ্চে অতুলন। প্রথমে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পুরো মঞ্চ পীঠের আয়তন জোড়া একটি কাঠের ফ্রেমে দরবার, তাঁবুর অনুকরণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্তরভাগ তৈরি করা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এবং তার দুধারে (দর্শনানুপাত) অনুযায়ী অন্যান্য তাঁবুর অংশ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে মোতায়েন রক্ষীবাহিনী টহল দিচ্ছে। কিংবা, দিল্লীর রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদের চত্বরের দৃশ্য—যেখানে সামনে পিছনে অস্থির পদচারণা করতে করতে নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আর জনতার আর্তকোলাহলের সঙ্গে দিল্লীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ ব্যবস্থায় নাট্যকারের নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হল—

> দিনাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের

আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামুর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে : আর একজনের বয়স কম—গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' এবং 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মঞ্চের ওপর যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্তব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রঙ্গামহলে 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে বক্স-সেটের ব্যবহার করলেন।

এরপর মঞ্চ ব্যবস্থার রীতি আরো সহজ ও সরল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপর কেবল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থবির মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্তাঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়েজানবহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গামঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গামঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গামঞ্চে

এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে নাটকের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চ-আলোকসম্পাত—আবহসংগীত :

এখন মঞ্চে আলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে পশ্চাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ট অঙ্গ হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্যবস্থা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : (১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অভিনয় মঞ্চে ঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাঙ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসঙ্গত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চ সজ্জায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চ পরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চে আলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুক্ত আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রঙ্গমঞ্চে অপর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে

উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মি সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চ যেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে আলো সরবরাহ করত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেইরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চেও এবম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চসজ্জা চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থায়া। সেই ছায়া পশ্চাঝপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাত্রার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্পেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশ্চাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙনো দু'ফুট চওড়া ঝালর (যেটি রঙ্গপীঠের ওপর থাকত)-এর অন্তরালে জ্বালান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশ্চাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভুতটা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকম—দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্নবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ

মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাই—যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়নাম রূপটা ঠিকভাবে ফুটে উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সঙ্গে ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তরঙ্গতায় বেদনার তরঙ্গকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুক্ত স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রঙ্গামঞ্চে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথাবার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সঙ্গে আলো এখানে যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য

আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উজ্জ্বল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসঙ্গী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উক্ত দৃশ্যকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রক্তাক্ত হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতঙ্কিত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তরগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্তন্না হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে গেছে অভুক্ত স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

(নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ... কুঞ্জ! ... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

ঝড়ের শব্দ—সাঁই সং.

দৃশ্যাংশটুকুর অভিনয় পুরোটাই আবহসংগীত নির্ভর। নাট্যকারের নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলবার জন্য এখানে আবহসংগীতের একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতার খুব দরকার। কিংবা দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জর হাত বেঁধে দিচ্ছে আর কাঁদছে—তারপর উভয়ে উভয়ে মুখেণ্ণ দিকে তাকিয়ে—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবহসংগীত তো এদের অব্যক্ত বক্তব্যকে, নিবিড় প্রেমের নিদারুণ বেদনাকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেবে।

আবহসংগীত বলতে আমরা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারকারী সুরলহরীকে আর শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'নীলদর্পণে'র কথা ধরা যাক, যেখানে চারজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। আবহসংগীতের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। অথবা, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে—আবহসংগীত ছাড়া এ দৃশ্যের অভিনয় চিন্তা করা যায়না। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশে—

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কারসঙ্গে কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত

মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

(আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ করতে থাকে)

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে-ে-ঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ্।
(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আবহসংগীত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে পুরো ব্যাপারটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পারবে না।

অতএব নাটকে আবহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিকে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যেরকম সেরকম musical instrument ব্যবহার করা হত। তার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন পরিচালকরা অভিনয়ের ওপর জোর দিতেন, আর দর্শকরা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চরিত্রের মুখে নাট্যকাররা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথার বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃবর্গ কণ্ঠস্বরের উৎক্ষেপণ—কম্পনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টানবার ব্যবস্থা করতেন। তাই আবহসংগীত ব্যাপারটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কারণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকের প্রথম অভিনয়ে চুনাগলির ফিরিঙ্গি কনসার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। তার জন্য সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে থিয়েটারে ফিরিঙ্গি কনসার্টই ব্যবহার করা হত। লেবেডফ তার নাটকে বিলিতি বাজনদারদের এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিঙ্গি কনসার্টের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বীর, করুণ ইত্যাদি রস বোঝানোর জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানোর জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দার আড়বাঁশী, ছোট বড় নানারকমের ঝাঝই ছিল আবহসংগীতের উপকরণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আবহসংগীতের প্রয়োগ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আরম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্রতর এবং অভিনয়ের রস ঘনীভূত করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের সুসংহত ব্যবহার। এই কাজ করবার জন্য তিনি তখনকার ব্রডকাস্টিং কপপোরেশনের বাংলা কর্মসূচীর অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড়বার প্রয়োজনে যখন ভারবাহীরা সোনার তাল বহন করছে নীরবে, তখনকার তীব্র বিরহ বেদনাসূচক আবহসংগীত আজও

আমার কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানের এই অঙ্গাটির অনুপস্থিতি আজ আর কল্পনা করা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিংবা অঙ্গাভিনয় হোক, আবহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতার বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ, আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হচ্ছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধ্বনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বক্তব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৮৭.১৬ মূলপাঠ ৮ : 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য 'মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর

আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আপ্তবাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। "নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড।" "এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিবিহীন।" ('নবান্ন'—হিরণকুমার সান্ন্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১)।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী—বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অঙ্কে বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বঙ্গাদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তবসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্বচ্ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সঙ্কটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অঙ্কের দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন—"সুদূরের পটভূমি রক্তিম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গো উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।"—এ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চাননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের লজ্জা শরম খুইয়ে বনেজঙ্গালে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়; উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বক্তব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্ত্বেও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সঙ্গো নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সঙ্গো তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সঙ্কটে হায়েনারা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্ক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমানানা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে (?) বিনোদিনীর সঙ্গো নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রামবাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে,

তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তবানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্ত আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধ্বংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংস যতই বড় হোক, প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার আশা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সে তো চিরন্তন! মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছে—"মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।" কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়—ভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—"জোর জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!" এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তির এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর "জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্য দিয়ে" 'ধর্মগোলা' স্থাপনের সঙ্কল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অঙ্কে পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্ত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৮৭.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধ্বনি, আবহসংহীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায়য় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশ—(১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে মঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদূভয়ের সুসঙ্গত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর

মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব ছিল, যা গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'নবনাট্য' পর্বে যে আলো-ধ্বনি-আবহসংগীত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক সূচনা 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চাভিনয়ে দেখা গিয়েছিল।

উন্মুক্ত আকাশ বা ধূসর প্রান্তরে জনতার মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের সূচনা। গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনা ও তার বিবর্তনে 'কোরাস' ও 'অর্কেস্ট্রা'র বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হত থিয়াট্রন। এই থিয়াট্রন থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে।

এদেশে লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় মঞ্চপ্রভাবে মঞ্চ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৃৎ-কৌশল যুক্ত হয়ে আধুনিক মঞ্চভাবনা ক্রমান্বয়েই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন যে মঞ্চকে বোঝায় তা হল প্রসেনিয়ম মঞ্চ। এর সূচনা করেছেন লেবেডফ, জড্‌রেলের লঘুনাটক 'দি ডিসগাইজ' এর বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় কালে। মঞ্চটির তিন পাশ ওপর দিক ঢাকা, সামনেটা খোলা, আয়তাকার, একধারে উঁচু বেদীর ওপরে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সেখানে অভিনেতারা তাদের সংলাপ উচ্চারণ করেন। পেছনে দৃশ্যপট এঁকে পর পর ঝোলান থাকত। প্রয়োজনমত এর ব্যবহার করা হত। ১৮৭২-এ জাতীয় নাট্যশালা বা সাধারণ রঙ্গামঞ্চে ধর্মদাস সুর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য এধরনের একটি মঞ্চ গড়েছিলেন। পরে অমর দত্ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে দৃশ্যপট ও আসবাবপত্রে আরও বাস্তবতা আনেন। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন ঘটান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনা করেন, সেইসঙ্গে পার্শ্বপট ও পাদপ্রদীপ তুলে দেন। ফলে শিল্পীরা স্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথ পান। ফলত মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

চতুষ্কোনপ্রসেনিয়ম মঞ্চকে প্রয়োজনানুযায়ী এক, দুই বা ত্রিস্তরীয় মঞ্চ করা যায়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য মূলত দ্বিস্তরীয় মঞ্চ। "শহরের রাজপথ। পাশে ধনীর বাসভবন" প্রভৃতি মঞ্চের ডানদিকের বর্ণনা। "আর মঞ্চের বাঁদিকে এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিন.....কুঞ্জ রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট.....ইত্যাদি।" শিশিরকুমার তাঁর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' তে এর ব্যবহার করেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনায় শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বল্পতম আয়োজনে মঞ্জ পরিকল্পনা করা হোত। তাই এ মঞ্চ বস্তুভারের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠল। আলোধ্বনি ও আবহসংগীত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রধানের বাড়ি থেকে দয়াল-এর চাল নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাধিকা কুঞ্জকে কুকুরে কামড়ানো হাত বেঁধে দিচ্ছে ও কাঁদছে—দৃশ্যে আবহসংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবধর্মী দৃশ্য রচনা, জীবনের বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বস্তুত গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য।

'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর', চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য— এখানে নবান্ন উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এটি নাটকেরও শেষ দৃশ্য। অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষাণ-কৃষাণীরা। এদিকে ইতোমধ্যে শহর থেকে আমিনপুরে ফিরেছে নিরঞ্জন-বিনোদিনী, তাদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকাও ফিরে এলো। অবশেষে শেষ দৃশ্যে 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার ফেরে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের দুর্যোগ, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদের পর শেষ দৃশ্যেই সমাদ্দার পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন ঘটে। সর্বস্ব হারানো দয়াল সব সঙ্কটকে তুচ্ছ করে বলেছে, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, আবার আকাল আমাদের আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার উদ্দীপক ভাষণ, "জোর, জোর প্রতিরোধ এবার প্রধান।" দয়ালের এ ভাষণ যতই আকস্মিক ও আতিশয্যপূর্ণ হোক না কেন, এর সফল অভিনয় নাট্যামোদী মহলে নতুন দিগন্তের আভাস এনে দিয়েছিল।

নবান্নের অভিনয় সাফল্য, নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে। নবান্ন জটিল নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি আবেগ সৃষ্টির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নবান্ন নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনার মাধ্যমে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন ও ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার যে দায় ও দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল, তা যথার্থভাবে পালন করেছে।

নাটকের তিনটি অঙ্ক পরম্পরায় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, মারী-মন্বন্তরের যে দৃশ্যপট রচনা করেছে, ইতিহাস সেখানে থেমে থাকেনি। তাই ধ্বংস বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংসের মধ্যেই থাকে প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা। তাই শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়। নবান্নের শেষ দৃশ্য সেই বার্তাই বয়ে এনেছে। দয়ালের কথায়, "মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে.....কই মরিনি তো আমরা"। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে। গাঁতায় খাটা (৪/১), ধর্মগোলা স্থাপনের সঙ্কল্প শেষ দৃশ্যে প্রতিরোধ রচনার প্রতিজ্ঞা আমিনপুরের মানুষকে সঙ্কট উত্তরণ শেষে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। নবান্নের শেষ দৃশ্য তাই বিশেষ তাৎপর্যবহ। নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ গঠনের লোকায়ত উৎসবের আয়োজন প্রভৃতির দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নাট্যকার যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৮৭.১৮ অনুশীলনী ৪

১। "সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপরডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই, এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না।"—কে, কোথায়, কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন? 'মিত্যু' থেকে 'গত্যন্তরে'র কি উপায় স্থির হয়েছিল লিখুন।

২। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও লক্ষ্য প্রমাণ করে নাটকটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক। নাটকের অভিনয় গঠনরীতিতে তার আভাস আছে। —আলোচনা করুন।

৩। "নবান্ন' বাংলা রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল"—সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। "ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি।"—কার লেখা, কোন নাটকের অংশ? কে এই কথা কখন বলেছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। "নবান্ন'কে একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক বলা হয়।"—নাটকটিতে দুর্গতি প্রতিরোধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্ণনা করুন।

৬। 'নবান্ন' নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় বিশেষত মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা ও আবহসংগীত একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। —মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরুপণ করুন।

৮৭.১৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) অভিনবত্ব নাটকের বিষয়বস্তুতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, মারী ও মড়কে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য কোলকাতা শহরের পার্কে জমায়েত হচ্ছে লঙ্গারখানায় সামান্য খাদ্যের জন্য। এ বিষয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম।

(খ) নাটকে কোন নায়ক চরিত্র নেই। নাটকের চরিত্রগুলির সামগ্রিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য নির্ভরশীল।

(গ) নাটকের সংলাপ, বাস্তবমুখী ও জীবনানুগ।

(ঘ) এ নাটকের মঞ্চ, দৃশ্য, আলো ও ধ্বনির ব্যবহারে অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। প্রথম প্রকাশ 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪৪-এ, প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

৩। কৃষকের জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক হল—
নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।
জমিদার দর্পণ—মীর মশাররফ্ হোসেন।
নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

৪। ৭.৩ অংশের 'দেশকাল' পর্যায়টি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৫। ৭.৩ অংশের 'নামকরণ' অংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) যুদ্ধ, দুর্যোগ, মন্বন্তরে আমিনপুর গ্রামের মানুষ যখন বিপন্ন, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ যখন সকলকে পীড়িত করছে, তখন বন্ধু দয়ালকে সম্বোধন করে প্রধান সমাদ্দার একথা বলেছে। সে শুনেছে বিত্তবান মানুষেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য লঙ্গারখানা খুলে খাবার বিতরণ করছে। এই সংবাদে তার আশা শহরে গেলে প্রাণধারণের জন্য অন্তত দুমুঠো অন্ন জুটবে।

'অন্নকুট' শব্দের বাচ্যার্থ হল অন্নের পাহাড়তুল্য অন্নরাশি বা খাদ্যস্তুপ। বিশেষ তিথিতে দেবার্চনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অন্ন' প্রসাদ হিসেবে সাধারণে বিতরণ করা হয় যে উৎসবে তা অন্নকুট নামে পরিচিত। এখানে ব্যঞ্জনার্থে শহরের লঙ্গারখানা থেকে রান্না করা খাদ্য বিতরণের আয়োজনকে 'অন্নকূট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার 'সরকার' রাজীব বলেছে। কালীধন চালের মজুতদার। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবার জন্য চাল গোপনে গুদামজাত করে, বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাল সহজভাবে না পেলে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক ভদ্রলোক চাল কিনতে এসে কোথাও না পেয়ে চাল-ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে হাজির হয়ে করজোড়ে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কালীধন অন্য জায়গা থেকে পঞ্চাশ টাকা দামে সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় কালীধনেরই যোগ্য কর্মচারী রাজীব এই উক্তি করে।

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে অহসায় ছাপোষা সাধারণ ক্রেতা ভদ্রলোকের প্রতি বক্তা রাজীবের তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হীন চরিত্র কালীধনের সাহচর্যে রাজীব তার প্রভুরই মত কুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

(গ) বক্তা প্রধান সমাদ্দার। তাঁর দুটি পুত্র শ্রীপতি ভূপতি দেশের ৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। পুত্রহারা পিতার এই বিলাপ তাঁর অন্তর বেদনাকে প্রকাশ করেছে। কুঞ্জ প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও শ্রীপতি-ভূপতির জন্য বেদনাবোধ করে বলেছে—"শ্রীপতি-ভূপতির ব্যাথা বড় কম বাজে নি এই বুকে জানলে জেঠা"—কুঞ্জ এজন্য ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরে। তাই বৃদ্ধ জেঠাকে স্বান্ত্বনা দেয়।

(ঘ) উক্তিটি প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউ-এ যখন ইংরেজ সরকার বিব্রত শুধু নয়, বিপন্ন, তখন সংগ্রামীদের ওপর প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামের বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের পীড়ন শুরু করে। পুলিশের পীড়নের ভয়ে অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন. সংগ্রাম ছেড়ে সংকটকালে যারা পিছিয়ে আসে তারা জাতীয় জীবনে কলঙ্ক স্বরুপ সন্দেহ নেই। নাটকে পঞ্চাননী চরিত্রটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে রচিত। অকুতোভয় পঞ্চাননীর দেশপ্রেম, দৃঢ় চরিত্রবল, সংকটে যথার্থ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল—এই সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়।

২। এই এককের ৭.৯ অংশের 'নবান্ন' নাটকের গান, অংশটি এবং সারাংশের প্রাসঙ্গিক অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ ও প্রাসঙ্কি আলোচনা পড়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'প্রাসঙ্কি আলোচনা' পর্যায় অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। গণনাট্য হিসেব 'নবান্ন'র অবদান ও গণনাট্য আন্দোলনে নবান্নের ভূমিকা অংশ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ৩ :

১। (ক) ৪৫ (খ) প্রধান (গ) রাধিকা

২। পরিচয়ের জন্য চরিত্রলিপি এবং ৭.১১ অংশের উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'র সাহায্য নিন।

৩। বক্তা দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

ব্ল্যাক মার্কেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কালোবাজার'। খোলা বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে অতিরিক্ত মুনাফায় বেশি দাম দিয়ে বিক্রি করা। এভাবে অর্জিত হিসাব বহির্ভূত অর্থই কালো টাকার (Black Money) উৎস।

মজুতদার শব্দটি আরবী 'মৌজদ' + দার (ফরাসী প্রত্যয়) গড়ে উঠেছে।

উদ্ধৃত উক্তির মূল প্রসঙ্গ হল দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, শহরের রাজপথ সংলগ্ন ধনীর আবাস। সেখানে বিবাহোৎসব। গৃহকর্তা-বড়োকর্তার হাজার খানেক নিমন্ত্রিত। নির্মলবাবু প্রসঙ্গত বলেছেন। জিনিসপত্তর জোগাড় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বড়োকর্তা জানান যদ্দিন চোরাবাজার আছে, ততদিন—কথা অসম্পূর্ণ থাকতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক চোরাবাজারের প্রশংসার ভঙ্গিতে বলেন, চোরাবাজার আছে বলেই কিছু আটকাচ্ছে না। তাই, তিনি প্রকাশ্যে চোরাবাজার বা ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারদের সমর্থন জানান। নির্মলবাবু অবশ্য বলেছেন পয়সা যাদের আছে, তারা একথা বলতে পারেন।

(প্রশ্নটির পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করবেন।)

৪। ৭.১১ অংশটি পাঠ করে উত্তর তৈরি করুন। গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় অর্থে যাকে নাটক বলা হয়, সে অর্থে এখানে নায়ক নেই, তবে প্রধান বা কুঞ্জকে জীবনসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণসূত্রে মুখ্য চরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। বক্তা সুজন, সাধারণ গ্রামবাসীদের একজন। এঁরা কুড়ি-পঁচিশ জন প্রধান সমাদ্দার বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনে বসে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত।

আলাপচারিতার মধ্যে ফকির বলেছে, বাংলা দেশের গ্রামীণ সন্তানরা বাবার দেনা ঘাড়ে জন্মায় এবং তারা শেষ জীবনে নিজের দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যায়, এমনটাই চিরকালটায় ঘটছে। এর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নেই।

এই কথার উত্তরে সুজন বলেছে, এতদিন ধরে এমনটি ঘটেছে বলেই, তা মেনে নিতে হবে তা কেন? কেন এর ভালমন্দ বিচার করা হবে না? এই কথার মধ্য দিয়ে সুজনকে অনেকটা বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

৬। ৭.১১ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ভাল করে এটি পড়ে নিয়ে উত্তর দিন।

৭। ৮। ৯। — ৭.১২ অংশটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখুন।

১০। ৭.১২ ও ৭.১৩ অংশের শেষ পর্যায়ে নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১১। শহরে বাসকালীন অসহায়, বিপন্ন কুঞ্জ, রাধিকাকে বলেছে। হৃদয়হীন, শহর জীবনের চেয়ে তার নিজের গ্রামে কুঞ্জ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, এই ধারণা থেকে কথাগুলি বলেছে।

হৃদয়হীন শুষ্ক শহর জীবনে কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার স্বগ্রামে স্ব-ভূমিতে সে সুস্থ বোধ করবে, এই প্রত্যয় থেকে সে কথাটি বলেছে।

বক্তার এই মন্তব্য থেকে তার মাটির প্রতি চিরন্তন মমত্ব ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। এই সংলাপটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার উচ্চারণ করেছে। সংলাপটি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

১৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুরের স্থানীয় পোদ্দার তথা চোরাচালানকারী হারু দত্তের। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয় শহরে পাচার করবার জন্য।

চন্দরের অল্পবয়সী মেয়ে। তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেলে, অনেক যত্নে সে মা-মরা মেয়েটিকে লালন করে বড় করেছে। খুকীর মা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে চন্দরের মেয়েকে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয়। হারু দত্ত চন্দরকে দিয়ে একটি কাগজে টিপ-ঠাপ দিইয়ে নেয়।

এখানে বক্তা হারু দত্তের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সে শুধু মজুতদারই নয়, একজন হীন মেয়ে পাচারকারী। ধুর্ত ব্যবসায়ী এই অন্যায় কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে করে। পাকাপোক্ত করবার জন্য নিরক্ষর মানুষগুলোকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত কথা লিখিয়ে নেয়।

অনুশীলনী ৪ :

১। 'নবান্ন' নাটকে দয়াল, চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে একথা বলেছেন। প্রসঙ্গটি হল ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা।

অল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই দুরুহ। তারই একটা উপায় সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ঘরে খাদ্যাভাবের পরিণতি কি দয়াল তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দয়াল এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন ফসল রক্ষে করতে না পারলে 'মিত্যু ছাড়া গত্যন্তর' থাকবে না।

'মিত্যু' থেকে গত্যন্তরে'র উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা জনে নানা কথার অবতারণা করলেও কোনো ইতিবাচক মতে পৌঁছানো যখন যাচ্ছে না, অথচ বড়োকর্তা এটা বুঝেছে "দুইচার দিনের ভেতর ফসল কাটা হল তো হল, নয় তো বিলকুল পয়মাল হবে।" অবশেষে দয়াল 'সকলে মিলে গাঁতায়' খাটার প্রস্তাব দিয়ে বলে, "অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি পাওয়া যায়, সকলে মিলে গাঁতায় খাটার পিতিজ্ঞে করে, তা হলে একদানা ফসলও জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে ফসল গোলায় তুলে ফেলা সম্ভব।" তাই ফসল যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে। আমিনপুরবাসী এভাবেই মিত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে।

২। 'নবান্ন'-এর গঠনরীতি (৭.৮ অংশের মূলাঠ ৪) সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। বক্তা মূলাপাঠ ৭(দ্রষ্টব্য ৭.১৫) অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৪। চতুর্থ অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে উদ্ধৃত কথাগুলি আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রধান সমাদ্দারের কথার উত্তরে বলেছে দয়াল মণ্ডল। অন্য সকলের মত দয়ালের ওপর দিয়েও জলোচ্ছ্বাসের দাপট গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনেকেই বেঁচে আছে, তখন এমনটি করতে হবে যাতে আকাল আর আচম্বিতে এসে কোনো স্বজনকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। দয়ালের এই উক্তির মধ্য দিয়ে একটি আশাবাদী মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৫। মূলপাঠ ৩ (দ্রষ্টব্য ৭.৭) অংশের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৬। ৭.১৩ অংশের মূলপাঠ ৭ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৮৭.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য—*নবান্ন*।
২। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল— *প্রসঙ্গ : নবান্ন*।
৩। ড. দর্শন চৌধুরী — *গণনাট্য আন্দোলন*।
৪। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম-৩ য় খণ্ড)*।
৫। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত*।
৬। বহুরুপী — *'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা ১. অক্টোবর ১৯৬৯ এবং স্মারক সংখ্যা ২, অক্টোবর ১৯৭০*।

৮৭.২১ অতিরিক্ত পাঠ

পরিশিষ্ট—১

'নবান্ন' নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হওয়ার পর সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন লেখক ও সমালোচক যে মতামত প্রকাশ করেন তার কয়েকটির নির্বাচিত অংশ উপস্থাপিত হল :

১৯৪৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হল—

'জবানবন্দী' বাংলা নাট্যধারাকে নতুন পথে শুধু চালনা করার ইঙ্গিত দিয়াছিল। 'নবান্ন'র সেই ধারা আরো অগ্রসর হইয়াছে, গণনাট্য সংঘের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমাদের দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত জনজীবনকে ইহারা নাট্যরুপ দিতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া বাংলার কৃষক সাধারণের ওপর দিয়া যে ঝড়-ঝাপটা যাইতেছে 'নবান্ন' তাহারই আলেখ্য। অতি পরিচিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্তের পরিবর্তে এই স্তরের জনগণ সম্বন্ধে নাটক লেখা ও অভিনয় করা যে কি দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহু চরিত্র সমন্বিত এই সুদীর্ঘ নাটকটি যেরূপ কুশলতার সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বড় হইতে ছোট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয় সমান তালে চলিয়াছে। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনায় ইহাদের অভিনয় কোন অংশে ন্যূন মনে হয়না; বরং নতুন দৃষ্টি ও মননের গুণে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ঐ একই তারিখে যুগান্তর পত্রিকা লিখল, "এতকাল আমরা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পেশাদারী অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গণনাট্য সংঘ এক নতুন জিনিসের আমদানী করিয়াছেন, তাহারা কেহই পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নহেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যুগের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন তরুণ তরুণীরা এই অভিনয় করিয়াছেন। আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায়

বাংলার সেই দুঃস্থ কৃষকের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্যসত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। যতদূর সম্ভব গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন'কে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত বাঙ্গালার যে দৃশ্য ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়াঅশ্রু সংবরণ করা কঠিন। এই ধরনের নাটক কেবল নতুনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে দুঃস্থ ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক।"

ওই সালেই **('পরিচয়' চৈত্র, ১৩৫১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নবান্ন'কে ভারতের মর্মবাণী ঘোষণা করে লিখলেন, 'এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করেনা, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গামঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই।'

ওই সংখ্যায় (পরিচয়ে) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করে সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেছে।'

হিরণ সান্যাল (পরিচয়, পৌষ ১৩৫১) বলেছেন, 'সংলাপ, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গামঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটা সাধারণ সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, 'নবান্ন' নাটকে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুনত্বের বার্তাবহ। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র আগে নাটক ছিলনা, একথা বলা যাবে না কিন্তু তা থেকে কোন নাট্যকার তেমন প্রেরণা পাননি, কোন গ্রুপ থিয়েটারেরও জন্ম হয় নি, কোন আন্দোলনও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে 'নবান্ন' ক্রান্তিকাল-সৃষ্টিকারী এক অপূর্ব শিল্পকর্ম, ঐতিহাসিক দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

'নবান্ন' নাটকের কিছু অন্যতর সমালোচনা।

'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করেনা। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করেনা। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী প্রধান আসামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত। যাদের দেখি

—মজুতদার, নারী-ব্যবসায়ী— তারা ঘৃণ্য বটে কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মাত্র, কোন শ্রেণীর প্রতিভূ নয়। আর বাঁচার পথ?—(যা নাটকের শেষে জোর করে জুড়ে দেওয়া একটা ক্রোড়দৃশ্য) সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখ-কষ্ট মিটে যাবে। অর্থাৎ, কোন লড়াইয়ের দরকার নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম মিছে কথা। অল্প কথায়, এই হল 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বিপ্লবটা কোথায়? কৃষক পাত্রপাত্রী 'নবান্ন' পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন তা সত্যি, তাঁরা কৃষকের ভাষায় কথা বলেছেন এটাও ঠিক, কিন্তু তবু কি তাঁরা কৃষকের কথা বলেছেন? শ্রমিক-কৃষক নিয়ে নাটক রচনাই কি গণনাট্যের শেষ কথা? তাহলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-কে গণসাহিত্য বলতে দোষ কি? আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয়না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থভাবে ফুটেছে কিনা, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা— এটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এইভাবে বিচার করলে, 'নবান্ন'কে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়? তার ওপর আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি এমনভাবে রচিত যে নাট্যমঞ্চের বাইরে তার অভিনয় এক প্রকার অসম্ভব।

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা। রচনা : প্রকাশ রায় (প্রদ্যেৎ গুহ)। দ্রষ্টব্য : মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খণ্ড) — সম্পাদনা : ধনঞ্জয় দাশ, ১৯৭৯, পৃঃ ৬৫।

পরিশিষ্ট — ২

'নবান্ন' নাটক প্রকাশ ও গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে সফল অভিনয়ের পর সমকালীন কয়েকটি প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিচে মুদ্রিত হল :

(ক)
নবান্ন/সুশীল জানা

শ্রীরঙ্গামে 'নবান্ন'র অভিনয় দেখলাম। এর আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির পটভূমিকায়। শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রাচীন পাশব-নীতি প্রজামণ্ডলের মাঝখানে ধনপ্রাণের বিনিময়ে একটা তথাকথিত শৃঙ্খলা নিয়ে এলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাংলার বাসিন্দা যারা—যারা কৃষাণ, কৃষি, মজুর, যারা শুধু এতদিন পরিচয় পেয়ে এসেছিল তাদের নিকটতম প্রভু জমিদার-মহাজনের, তাদের সুমুখে আর একটা নির্মম পরিচয় উদঘাটিত হল।

এই এর শুরু। তারপর এলো ঝড়—এলো প্লাবন, চারিদিক জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কালো ছায়া। ১৯৪৩-৪৪ সাল জুড়ে চললো এক নিরবচ্ছিন্ন নিরুপায় অবস্থার ধারা। ধান নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই, সহায় নেই, গ্রাম-বাঙলা ছারখার হতে চল্‌লো। জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে যারা রূপ

দিয়ে নিজের করে নিতে পারে—তারাই বাঁচে, বাঁচার চেতনায় জর্জরিত হয়, আর দুর্জয় হয়ে ওঠে। যারা পারে না—তারা মরে। এমনি করে মরে গিয়েছে অনেকে। তবু নিঃশব্দ এই শ্মশানভূমি থেকে জীবনের ঝঙ্কার ওঠে। এই ঝঙ্কারই 'নবান্ন'র কাহিনী। রাজনীতি, মহাজনী-নীতি আর ধনতন্ত্রের কূটিল অর্থনীতি—এই তিন নীতির ঘূর্ণিতে পড়ে গ্রাম গ্রাম-বাঙলার জনগণ চললো ভেসে, আর দুর্যোগের অন্ধকারে চরম অসহায়তার মাঝখানে পরিচয় লাভ করল একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধমূলক অমর জীবনের—বিরাট সংগ্রামশীল জীবনের। এই হলো 'নবান্ন' নাটকের আবহাওয়া।

প্রচলিত নাট্যকাহিনীগুলির মতো এর গল্পাংশ কোনো নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ক্রমোন্নত একটা চরম আবহাওয়ায় এসে শেষ হয়নি। এবং কাহিনী গোটা আমিনপুর নিয়ে—বাঙলার সমস্ত গ্রামকে নিয়ে। দুর্দিনতাড়িত প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের আশেপাশে অসংখ্য পরিবার এসে মিশেছে পথের প্রান্তে। নায়ক-নায়িকার বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে সবগুলি চরিত্রই তাদের জীবনের নির্মম বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে গিয়েছে। আগাগোড়া একটা জীবনের বাস্তববোধকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠতে শোনা যায় প্রত্যেকটি চরিত্রে—সেখানে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়। একজনের দুঃখ নাটকের পরিণতির খাতিরে আর সকলের মর্মবেদনাকে ম্লান করে দেয়নি। জীবনের এই বাস্তববোধ আর সামঞ্জস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দুর্লভ গুণ। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে আঘাত করে। মনে হয় এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হচ্ছে একটা চরম আবহাওয়ায় এসে। তাতে নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতি ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৪২ সাল থেকে ৪৪ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন বিপর্যয় নেমে এসেছে গ্রাম-বাঙলার গণজীবনে—তার প্রত্যেকটিতে দেখানো হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন করে। গণজীবনের বিরাট এক গোষ্ঠী নিয়ে এর পরিকল্পনা, তাতে কিন্তু এইটে আসাই স্বাভাবিক। এবং গত তিন বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়—তারা কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়। প্রত্যেকটি নাট্যস্রষ্টার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। যার ফলে বিভিন্ন বিপর্যয়-সমন্বিত দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'নবান্ন'কে ভোলা যায়না। এই তিন বছরের আবহাওয়া দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু কারণে যেমন নাটকীয় হয়ে উঠেছে—তেমনি একটা বিরাট ও অমর জীবনদর্শনের পরিচয় হয়েছে—যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা, আমাদের জাতীয় জীবন—আমাদের গণজীবন বাঁচতে পারেনা। সে হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা এসেছে ধীরে ধীরে—আমাদের গণজীবন অর্জন করেছে একে বীর্য দিয়ে, মূল্য শোধ করেছে নির্মমভাবে। গোটা নাটকটি জুড়ে এই চেতনা ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হয়েছে। নানান বিপর্যয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে আমিনপুরের সমাদ্দার-পরিবার আর আশেপাশের বহু পরিবার পরিচয় পেয়েছে তার চারপাশের। পথের জীবনের পরিচয় পেয়েছে পথের। এইরকম একটা সমগ্রতার সঙ্গে পরিচয়ের পরই একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে উঠতে পারে। তাই নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতির যে ত্রুটিটা বিচ্ছিন্ন

দৃশ্য বলে মনে হয়—সেই ত্রুটির অন্তরালে গত তিন বছরের আবহাওয়ার একটা ক্রমপরিণতির ধারা নাট্যসংঘাতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সুষ্ঠুভাবে এগিয়েছে। খোলা মনে শিথিল দেহে নাটক-দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে হবে প্রতিজ্ঞা-কঠোর মন নিয়ে, দৃঢ় মুষ্ঠিতে বলিষ্ঠ এই প্রাণশক্তির উদ্বোধন 'নবান্ন'র প্রাণবস্তু। সমাদ্দার-পরিবারের পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ—গ্রামবাঙলার পিতৃপুরুষ প্রধান সমাদ্দার উন্মাদ নয়, সে একটা প্রাণপ্রাচুর্যের দুর্জয় উন্মাদনা। বাঙলার গণজীবনের এই প্রাণস্পন্দন কোথাও দেখিনি, 'নীলদর্পণে'ও না। এতদিন শুধু দেখেছি নিরুপায় মর্মান্তিক মৃত্যু, আর সকাতর আর্তনাদ। সেইটেই শুধু সত্য নয়—তারও আড়ালে জীবনের একটা সুগভীর আর্তনাদ আছে, যেটা সাহিত্যকে বিরাটত্ব দান করে—সার্থক সৃষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সাহিত্যের সেইটেই বড় বাস্তব—বড় সত্য। সেই সাফল্যের পথযাত্রী রূপে আমরা 'নবান্ন'র রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর 'নবান্ন'র অভিনয়নৈপুণ্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পেছনে সমসাময়িক আবহাওয়ার এমন একটা মর্মান্তিক প্রেরণা আছে, যার ফলে তারা কমবেশি নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন বৃদ্ধ ভিখিরির চরিত্রে অধ্যাপক গোপাল হালদার, পঞ্চাননীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি। বড় চরিত্রগুলির তো কথাই নেই। এই নৈপুণ্যের মস্ত বড় একটা প্রেরণা যেমন অভিনেতাদের গণজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে, তেমনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীদের বিরাট আশাবাদী অবিচলিত দেশপ্রেমের জন্যও বটে।

বাঙলার নাট্যশালাগুলি মাকড়সার মতো জাল বুনে চলছিল ঘরের কোণের অন্ধকারে—হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সহস্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। দর্শকসাধারণ এই নিয়ে ছিল অন্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলে না ভিড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না নগরবাসীদের তথা জাতীয় জীবনের শিক্ষিত অংশের। নানা বিরোধী ভাবধারার মধ্যে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিচলিত হয়েছে। এবং মাঝখানে জাতীয় সংস্কৃতির উদ্‌যাপনকল্পে একদল তরুণ-তরুণীর আর্বিভাব ও গণনাট্য সংঘের সৃষ্টি বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চশিল্পকে এক নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। সুমুখে বিপদ আছে অনেক তবু আমরা আশা করব—বাংলা নাট্যসাহিত্যের, জাতীয় সংস্কৃতির, গণজীবনের সম্ভাবনাময় বিরাট সংগঠনের। গত তিন বছর নিশ্চয়ই নিঃশেষে হারিয়ে যাবেনা। জাতীয় জীবনকে যে নির্মম মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হবেনা। বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা জোগায়, তাকে মহান করে—বিরাট করে; তাকে পথ দেখায়।

'নবান্ন'র মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন—তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

(২)

নবান্ন / মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরনের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সংঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

'নবান্ন' নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এ এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি হবে পরে। এদের পাঠক-দর্শক-সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়না। গোড়া থেকেই বাঙালি এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই তো গণনাট্য সংঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সংঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপল্‌স রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটেছে না বলে বন্ধ হয়নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সংঘের অভিনয় এখনো তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সংঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণভাবে সংঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেননি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল তো হবেই।

কিন্তু ধ্বংস যত বড়ই হোক প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে. মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও যায়না, 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা 'গাঁতায় খাটতে' লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকেনা, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয়নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করবনা। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয় এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

(গ)

নবান্ন প্রসঙ্গে/স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'পরিচয়' সরাসরি রায় দিয়েছেন : 'নাটক হিসেবে 'নবান্ন'-কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।" তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়'-এর সম্পাদকেরও খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ " 'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।"

আমার মতে 'নবান্ন' রীতিমত সক্ষম রচনা, তার একাধিক দোষ ত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রথম কথা 'নবান্নে' কি পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবার আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কি কম? 'নবান্নে' পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গদেশকে। বাংলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য 'নবান্ন'। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই 'নবান্ন' সার্থক নয়। এ বইয়ের সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। 'নীলদর্পণ'-এর বহুকাল পরে বাংলার অপাংক্তেয় কৃষক বাংলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে। হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কি অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু-এক স্থানে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়।

'নবান্ন'-র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার Birthmarks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়। পুরাতনের জঠর থেকে আসে সে। যে দু-চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে-সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। 'নবান্ন' নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সেগুলিকে প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভিড়ে ঠাস বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলেনা। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সেই কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি, "নবান্ন নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।" 'পরিচয়' বলেছেন, "ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রকাণ্ড তালিকা

যাকে গত দু-বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।" যুগান্তকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভু? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্তকারী প্রতিভা 'নবান্ন' প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরি পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের কাজকে কি মোটেই সক্ষম রচনা নয় বলব? 'পরিচয়' সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারেনা। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও 'নবান্ন' এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ—যার সম্পর্কে এক কথায় বায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়।

(ঘ)

নবান্ন/কালিদাস রায়

'নবান্নে'র অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রঙ্গালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাস, উচ্চারণভঙ্গি এমন কি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা, কোনো, অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কি না বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে—চিরনগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আর একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা নাগরিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষীদের বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরের যুবক-যুবতী একই জাতির লোক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জ্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হারাধনের মতো যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলার দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি ; কিন্তু তাহাতে আমার তটস্থ উদাসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'নবান্নে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে, এই দুঃস্থ দুর্গতদের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করাহয় নাই। এজন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে—নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু কবিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহাছাড়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মোটের উপর 'নবান্ন' আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত

করিয়াছে। এই সমস্তই সাময়িক সন্দেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোনো ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা মনে হয়না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে 'নবান্নে'র ছায়া অপসারিত হয় নাই।

'নবান্ন' অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'নবান্ন'কে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতগুলি জীবন্ত জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রন্থন, খাঁটি বাংলার জীবনসূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোনো নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্যসাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্মস্থলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় একটা কোনো না কোনো পর্দার মধ্য দিয়া। 'নবান্ন' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্মস্থলকে প্রত্যক্ষভাবে উদঘাটিত করিয়াছে।

(ঙ)

নাট্যকলা : নবান্ন/হিরণকুমার সান্যাল

(১)

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সংঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব আশা করি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলেনা। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত-জীবনের সংবাদপত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানির হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা, রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে আজই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মতো সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

(পরিচয় : আশ্বিন, ১৩৫১)

(২)

'নবান্ন' বই আমি পড়িনি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচমকা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটন, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক-প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা :

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাই-এর ওপর যে-ভাবে গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র বৌর সলজ্জ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। 'তোরা যা, আমি যাবনা'। বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয়নি; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আঙ্গিকের এই অনুকরণ 'নবান্ন'র আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিমছাম পোশাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায়. নেমেছিলেন। একথা সত্য হলে তাঁর পোশাক ও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়দুরস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু-একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। 'নবান্নে'র নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে এরা অতি সামান্যই ক্ষুন্ন

করেছে। 'নবান্নে'র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দ্বৈতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশি হননি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির-প্রাঙ্গণে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ, যারা দু'দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন হাতড়ে খুঁজেছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশি বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশুহত্যার প্রবৃত্তি—পূর্ব নাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনা বিরচনে তা প্রায় অবান্তর।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নবান্নে'র এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা ওঠে—স্বর্ণকমলবাবু যার উল্লেখ করেছেন—একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তা যদি না সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর মতন অভিনেতার অভ্যুদয় হলো কি উপায়ে? 'সীতা' বা 'আলমগীর'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তাহলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানিনা। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা-বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় সে, দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলেনা তবু একাধিক কারণে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমলবাবু ও কালিদাসবাবু দুজনেই বলেছেন ও এ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত; তাঁদের সঙ্গে বিরোধ এই যে আমি 'নবান্ন' দেখেছি শুধু সমঝদারের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেরও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে স্টেজে নামালে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। এক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যেভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না

করে পারা যায়না। এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হবনা, যেমন হবনা অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে। জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজনবাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোটকথা এই যে, যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত তা গেল ভেস্তে, তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অবশ্য গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদুর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা একা বিজনবাবু নন, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্য সংঘ। এই সংঘের প্রেরণা ও উদ্যম ছাড়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'নবান্নে'র অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

(পরিচয় : কার্তিক, ১৩৫১)

(চ)
মন্বন্তর ও সাহিত্য/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়তো এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সঙ্গে তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসঙ্গাক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

(ছ)
ভারতের মর্মবাণী/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সংঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা

অরণ্যরোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আটের জন্য আটের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গামঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায়না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

কথাশিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক-সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সংঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যেরকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

(উদ্ধৃতিসূত্র : ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (৩য় খণ্ড)